একজন
স্বয়ংসেবক
প্রধানমন্ত্রী
— পৃঃ ২৬

# স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

শ্রীকৃষ্ণ
জন্মের
পারিপার্শ্বিক
— পৃঃ ৩১

৭১ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮।। ১৭ ভাদ্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৩ সেপ্টেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**সোমনাথপুত্র সঠিক কাজ করেছেন** ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

**খোলা চিঠি : এক দেশ, এক দিদি** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

**দেশের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য রপ্তানি বাড়াতেই হবে** ▯ অমিতাভ কান্ত ▯ ৮

**মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাঙ্গা বাধাতে চাইছেন, মানুষ কিন্তু সব দেখছে** ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ১১

**অজাতশত্রু রাষ্ট্রসাধক অটলবিহারী বাজপেয়ী** ▯ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

**অটলজী এক বড় মাপের রাষ্ট্রনায়ক** ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ১৭

**অজাতশত্রু অটলবিহারী বাজপেয়ী** ▯ ১৯

**অটল উবাচ** ▯ ২০

**সাক্ষাৎকার : 'সঙ্ঘের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বাজপেয়ী'** ▯ ২১

**অটলবিহারী বাজপেয়ী** ▯ ২২

**ভারতীয়করণ এখন আর কোনও স্লোগান নয়** ▯ অটলবিহারী বাজপেয়ী ▯ ২৩

**শান্তিনিকেতনে আচার্য বাজপেয়ীর স্মৃতি** ▯ তিলক সেনগুপ্ত ▯ ২৪

**একজন স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী** ▯ বিরাগ পাচপোরে ▯ ২৬

**শ্রীকৃষ্ণজন্মের পারিপার্শ্বিক** ▯ ড. সীতানাথ গোস্বামী ▯ ৩১

**ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নিজেকে শিক্ষক হিসাবে ভাবতে ভালোবাসতেন** ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৩৩

**গল্প : আদর্শ, কর্তব্য** ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

**এক মহাপ্রাণ মানুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ** ▯ সংকর্ষণ মাইতি ▯ ৪১

**ত্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : ভারতীয় গণতন্ত্রের ভূত ও ভবিষ্যৎ অটলবিহারী** ▯ ৪৩

**ভাদ্রমাসের কৃষিকাজ** ▯ ড: কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৫

**মার্কসবাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক (৪র্থ পর্ব)** ▯ দেবাশিস লাহা ▯ ৪৬

**নিয়মিত বিভাগ**

**উবাচ : ১০** ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯

**নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০**

▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**


**এই সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভলগ্নে স্বস্তিকার লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।**

**— স্বস্তিকা, সম্পাদক**

প্রকাশিত হবে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## টাকা খেয়ে মিডিয়ার মোদী বিরোধী চক্রান্ত

এখন খবরের কাগজ খুললেই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারের বন্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি দলটিকে জনমানসে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় অসত্য এবং মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে, এরকম কেন হলো? নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কীসের এত রাগ মিডিয়ার? নাকি রাগ মিডিয়ার নয়, অন্য কারও? তিনি বা তাঁরাই বিপন্ন রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন এবং সেটি মোটা টাকার বিনিময়ে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে দুটি অন্তঃতদন্তমূলক বিশ্লেষণ। ফাঁস করা হবে এমন কিছু তথ্য যা আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি।

**দাম একই থাকছে।। দশ টাকা**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani


সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

# সম্পাদকীয়

## আবার রণক্ষেত্র রাজ্য

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ৩৪ শতাংশ আসনের ফল রাজ্য সরকার ঘোষণা করিতে পারিবে। এইসব আসনে ফল ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি জারির ওপর স্থগিতাদেশও তুলিয়া লইয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করিয়া দেশের শীর্ষ আদালত জানাইয়া দিয়াছে যে, হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলে যেসব প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়াছিলেন সেইগুলিও আদৌ বৈধ নয়। কেননা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে অনলাইনে মনোনয়ন পেশ করিবার পদ্ধতিকে কোনওভাবেই বৈধতা দেওয়া হয় নাই। শীর্ষ আদলতের এই রায়ে নিঃসন্দেহে স্বস্তি পাইয়াছে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন। ক্ষমতাসীন দল এই রায়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিজয় মিছিল পর্যন্ত করিয়াছে। এখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ২০ হাজার ১৫৯ জন প্রার্থীর বিষয়ে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে পারিবে। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের সঙ্গে বিরোধী দলগুলি অবশ্য সহমত নয়। বিরোধীদের বক্তব্য, এই রায় নৈরাজ্যের শক্তিকে মাথা তুলিতে সাহায্য করিবে, ইহা গণতন্ত্রের জয় না ক্ষয় তাহা মানুষই বিচার করিবে। বস্তুত এই পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডামি প্রতিহত করিতে গিয়া মনোনয়ন পর্বে প্রাণ হারাইয়াছিলেন ৪০ জন মানুষ। সুপ্রিমকোর্টের এই রায় শুনিবার পর মৃতদের পরিবারের মানুষদের এই ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা আরও বাড়িবে এবং তাহা স্বাভাবিকও বটে।

ঘটনা হইল মনোনয়ন পর্বের মতো পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের জেলায় জেলায় আবার সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে। কোথাও প্রধান হওয়াকে কেন্দ্র করিয়া তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ, কোথাও আবার বিজেপি-সহ বিরোধীদের উপর হামলা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো বোর্ড গঠনেও চলিতেছে ব্যাপক সন্ত্রাস। বহু স্থানেই রক্ত ঝরিয়াছে, হিংসাত্মক ঘটনায় উত্তরদিনাজপুর জেলায় ইসলামপুরে একজন নিহত হইয়াছে। পুরুলিয়া ও মালদাতে আরও ৪ জন নিহত হইয়াছে। গাড়ি পোড়ানো হইয়াছে; বাড়ি ভাঙচুর ও লুঠ করা হইয়াছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকেই। শীর্ষ আদালতের রায়ের পর রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নের কার্য শুরু হইবে। কিন্তু ঘটিতেছে বিপরীত। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন যে নির্বিঘ্নে হইবে না ইহা প্রায় প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতেছে। উন্নয়নের জন্য শক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় বোর্ড গঠন লইয়া যেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে আইনের শাসন লইয়াই প্রশ্ন উঠিতেছে। বিজেপি বিষয়টি লইয়া ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পঞ্চায়েত নির্বাচন লইয়া বিরোধীদের অভিযোগকে অপপ্রচার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? কেননা নির্দলদের সংখ্যা বা শক্তি এত বেশি নয় যে স্থানে স্থানে তাহারা বোর্ড গঠনে বাধা সৃষ্টি করিবে। তৃণমূল দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ইহার জন্য দায়ী, তাহা আলাদা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাই শীর্ষ আদালতের রায়ে উচ্ছ্বসিত না হইয়া রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। কেননা আইনের শাসন রক্ষা করা সরকারেরই প্রাথমিক কাজ—রাজধর্ম।

## সুভাষিতম্

*নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।*
*বিক্রমার্জিত সত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা।।*

*সিংহকে বনের রাজা হবার জন্য কোনও অভিষেক বা সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। সিংহ নিজের পরাক্রমের দ্বারাই পশুদের রাজা হয়।*

# সোমনাথপুত্র সঠিক কাজ করেছেন

গূঢ়পুরুষের কলম

লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় পরিণত বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রাজ্য সিপিএম নেতাদের যথেষ্ট হেনস্থায় পড়তে হয়। বিশেষভাবে পরিবারের পক্ষ থেকে বিমান বসুর উপস্থিতিতে প্রবল আপত্তি জানান সোমনাথবাবুর সুযোগ্য পুত্র ব্যারিস্টার প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। এতটা পর্যন্ত সমস্ত খবরের কাগজেই লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়নি তা হচ্ছে প্রতাপবাবু বিশেষভাবে বিমান বসুর উপর এতটা রুষ্ট হলেন কেন? কারণ, সিপিএম দল থেকে সোমনাথবাবুকে বহিষ্কার করার প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন বিমান বসু এবং প্রকাশ কারাত। এই দুই ষড়যন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পর্যন্ত পাত্তা দেননি। লোকসভা বা বিধানসভার স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার পর নিরপেক্ষ হতে হয়। দলের নির্দেশ মেনে চলার হুইপ দেওয়া যায় না। স্পিকার দলের ঊর্ধ্বে থাকবেন এমনটাই সংবিধানের নির্দেশ। বিমান বসু, প্রকাশ কারাতরা সংবিধান মানেন না। তাঁরা বাস্তবে স্বৈরাচারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কলকাতায় সিপিএম দলের সদর দপ্তর আলিমুদ্দিনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দেওয়ালে প্রাক্তন সোভিয়েত দেশের একনায়ক স্ট্যালিনের একটি বড় তৈলচিত্র দেখা যায়।

এই স্ট্যালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে স্রেফ সন্দেহের বশে কয়েক কোটি নিরপরাধ রাশিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। জার্মানিতে ধরা পড়া যুদ্ধবন্দিরা দেশে ফিরলে স্ট্যালিনের হুকুমে তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই রকম একজন রক্তপিপাসু, ক্ষমতালোভী, স্বৈরাচারী শাসক ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ নেতা। যাদের রাজনীতির শুরু ষড়যন্ত্র দিয়ে। শেষ হয় ষড়যন্ত্র দিয়ে।

সোমনাথবাবুর বহিষ্কারের কথায় ফিরে আসি। সেটা ছিল ২০০৪ সাল। সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকারকে বাঁচাতে সিপিএম বাইরে থেকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই মার্কসবাদীরা সমর্থন তুলে নেয়। কারণ, কংগ্রেস সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অসামরিক চুক্তি করেছে। বিমান বসু এবং প্রকাশ কারাত ঘোষণা করলেন মনমোহন সিংহ সরকার সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দালাল। বিমান-প্রকাশ জুটি এরপরেই মার্কসবাদী এমপিদের একটি নামের তালিকা--- রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের কাছে পাঠিয়ে দাবি করে দলের এইসব সাংসদ সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। এই তালিকার প্রথম নামটি ছিল স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। অথচ সোমনাথবাবুকে নামের তালিকা পাঠানো অথবা তাঁর নামটি প্রথমে রাখার খবরটি জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি বিমানবাবুরা। সোমনাথবাবু আপত্তি জানালে ক্ষিপ্ত পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু স্পষ্টভাবে বলে দেন, ''পার্টি আপনাকে এমপি করেছে, স্পিকার করেছে। আপনি পার্টির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে বাধ্য।'' জবাবে সোমনাথবাবু চড়া গলায় বিমানবাবুকে জানিয়ে দেন, ''আমি আপনাদের পার্টিদাস নই।'' সময়টা ২০০৮ সালের জুলাই মাস। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে সোমনাথের কাছে আবার আসেন বিমান বসু। কড়া স্বরে বলেন, ''পার্টির সিদ্ধান্ত। ইস্তফা দিতে হবে। না দিলে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে।'' নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মুখের উপর জানিয়ে দেন, ''বহিষ্কারের হুমকি দেবেন না। স্পিকার দল নিরপেক্ষ। এই পদ রাজনীতির বাইরে। তাই আমি আগে সাংবিধানিক পদের মর্যাদা রক্ষা করবো।'' আগেই বলেছি কমিউনিস্টরা সংবিধান, শিষ্টাচার কিছুই মানে না। পদত্যাগ করবেন না জানিয়ে দেওয়ার পর সোমনাথবাবুকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারিখটা ছিল ২৩ জুলাই, ২০০৮। পরে তিনি বহুবার বলেছেন, ''২৩ জুলাই আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনার দিন।'' এই প্রতিবেদকের তা মনে হয় না। বরং এইদিন তিনি পার্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন। তাই ২৩ জুলাই তাঁর নবজন্ম দিবস। জীবনের শেষ অংশটুকু সোমনাথবাবু দলদাসমুক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে।

সোমনাথপুত্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় বিমানবাবুকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে একজন মানুষকে চূড়ান্ত অপমান করার পর তাঁর মরদেহের সামনে হাত মুঠো করে মাথার উপর তুলে লাল সেলাম জানানোটা বর্বরতা। অবশ্য এটাই কমিউনিস্টদের চরিত্র। তারা উপকারীর ক্ষতি সবার আগে করে। তেভাগা আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে কংগ্রেস সরকার। তখন বিনা পারিশ্রমিকে হিন্দুমহাসভার সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দি কমিউনিস্টদের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক মামলা লড়েছিলেন। তখন সোমনাথ পিতা হিন্দুত্ববাদী নির্মলচন্দ্রকে বাঙালি কমিউনিস্টরা সাম্প্রদায়িক মনে করেননি। ধান্দাবাজ কমিউনিস্টদের তাই বিশ্বাস করা যায় না। সোমনাথপুত্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় ধান্দাবাজদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করার কথা বলে সঠিক কাজই করেছেন।

# এক দেশ, এক দিদি

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনারা কি চান না যে প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পেতে? তাও আবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তবে জোট বাঁধুন। তৈরি হোন। কিন্তু গোটা দেশ দিদিকে এগিয়ে দেবে তো? ক'দিন আগে রাজ্যসভায় ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন দেখে দিদি একটু চিন্তায় আছেন। দিদিরই এক কাছের ভাই সেদিন আমায় কাছে ডেকে বললেন—

কত কিছুই তো শোনা যাচ্ছে মশাই। ফেডারাল ফ্রন্ট থেকে শুরু করে কংগ্রেসিদের পুরনো ইউপিএ জাগিয়ে তোলার গল্প সবই শোনা যাচ্ছে। মমতা না মায়াবতী, নাকি রাহুল, কে হবেন প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী ইত্যাদি অনেক গল্পই রাজনৈতিক মহলে চলছে। সবারই লক্ষ্য এক। বিজেপি হটাও, মোদী হটাও, দেশ বাঁচাও। ভালো কথা। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সেটা করতে গেলে যা দরকার, বিরোধীরা তা দেখাতে পারছে কই।

রাজ্যসভায় ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানে ড্যাং ড্যাং করে জিতে গেলেন এনডিএ প্রার্থী হরিবংশ। অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর মুখে স্বাভাবিক হাসি। সম্মিলিত বিরোধীরা রাজ্যসভায় বিজেপির থেকে এগিয়ে থাকলেও, মোদী-শাহের প্রার্থীকে হারাতেই পারলেন না রাহুল-মমতারা। এটা ছিল স্যাম্পেল টেস্ট। এটা থেকেই স্পষ্ট হয়ে

গিয়েছে ২০১৯ সালে দিদির জোট কী করতে পারবে।

স্রেফ ইগোর লড়াইতে বিরোধীরা লোকসভা ভোটের আগে একটি প্রতীকী জয় ছিনিয়ে নিতে পারলেন না এনডিএ শিবির থেকে। প্রথমেই জনতা দল ইউনাইটেড-এর থেকে প্রার্থী করে নীতীশ কুমারকে পকেটে পুরে নেয় বিজেপি। তার পরের চাল নবীন পট্টনায়কের বিজেডি-কে রাজি করিয়ে নেওয়া যে তিনি এনডিএ প্রার্থীকে ভোট দেবেন।

আর অন্য দিকে কী ঘটল? জোটের আম আদমি পার্টির নেতারা বললেন, একবার কি রাহুল গান্ধী ফোন করতে পারতেন না আমাদের। রাগ করে তাঁরা ভোটই দিলেন না। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, অন্ধ্রের ওয়াই আর এস কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমন্বয়ই তৈরি করতে পারলেন না বিরোধী শিবিরের দাদা-দিদিরা।

ফল যা হওয়ার তাই হলো। পরাজিত হলেন বিরোধী শিবিরের প্রার্থী। কোনও নির্দিষ্ট নেতা না থাকলে কী হয়, দেখিয়ে দিল রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের নির্বাচন। আর পরিকল্পিত রাজনীতি কাকে বলে সেটাও শিখিয়ে দিলেন অমিত শাহরা।

বিরোধীরা যে কোনও নেতা ছাড়াই লোকসভা ভোট লড়বেন বলছেন, তার পরিণাম কী হবে তা বুঝে যাচ্ছেন তো! এমনই ছন্নছাড়া থাকবে বিরোধী শিবির। ভাবা যায় বিজেপির মতো সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে দিদির লড়াইতে কোনও ডিসিপ্লিনই দেখাচ্ছে না কেউ।

দিদির এই লড়াইতে বাংলাকেই এগিয়ে আসতে হবে। দরকারে ওপার বাংলা থেকে 'বাংলাদেশি' ভোটার এনেও বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। কী বললেন, বাংলার ৪২টা আসন পেলেও সেটা সম্ভব নয়। সেকি। তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল!

**—সুন্দর মৌলিক**

# দেশের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য রপ্তানি বাড়াতেই হবে

অতিথি কলম

অমিতাভ কান্ত

রপ্তানি ক্ষেত্রে দুর্বার গতিতে এগোতে পারলে ভারতের সামনে অগ্রগতির বিপুল সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন নানা দেশের মধ্যে বিভাজিত হয়ে আছে। সেখানে রয়েছে নিরন্তর আমদানি-রপ্তানির পরিসর। এই সরবরাহ শৃঙ্খল বা supply chain রপ্তানি ক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়তে পারলে কেবল যে দেশের পক্ষে লাভই হবে তাই নয় একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে মানুষের কর্মদক্ষতা ও উন্নতি করার ইচ্ছে।

সকলেই জানেন ভারতের অর্থনীতি রপ্তানি ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ২০১৭-১৮ সালে পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রের রপ্তানি ছিল জিডিপি-র ১২ শতাংশ। এরই বিপরীতে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ছিল তাদের জিডিপি-র ৪২ শতাংশ। একইভাবে ২০০৬ সাল নাগাদ যখন চীনের গড় বৃদ্ধি ১৩ শতাংশ স্পর্শ করছিল তখন জিডিপি-তে রপ্তানির অংশ ছিল ৩৭ শতাংশের বেশি। তাই ভারতকে জিডিপি-তে দুই অঙ্কের বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল সন্ধান করতেই হবে।

হ্যাঁ, সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ভারতের রপ্তানি অবশ্যই বৃদ্ধির দিকে। কিন্তু রপ্তানি আরও বাড়াবার অনেক সুযোগ রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে মালপত্র ও পরিষেবা ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ। ২০১৭ সালের মে মাসে যে পরিমাণ রপ্তানি হয়েছিল ২০১৭-১৮ সালের মে মাসে সেই রপ্তানি ২০ শতাংশ বেড়েছে। এতে অনুমান করা যায় বিগত পাঁচ বছরে রপ্তানি বাণিজ্যে যে নিম্নমুখিতা ছিল আমরা তার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। এখনই সেই সুবর্ণ সুযোগ যখন চিরাচরিত অভিমুখ পাল্টে আমরা রপ্তানি বৃদ্ধিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই নেওয়া প্রচেষ্টাগুলির ওপর ভর করেই আমরা এগোতে পারব।

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক যে কাঁচামাল কিনেছিল রপ্তানির পর সে যাতে দ্রুত জিএসটি ফেরত পায় তার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে পারলেই স্বল্প মেয়াদেই রপ্তানি বাড়ানো যেতে পারে। বড়ো ধরনের রপ্তানি বৃদ্ধিকে মাঝারি মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখাটা বড়ো ব্যাপার। একবার বাড়লেই তো হবে না। বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসুবিধেগুলোকে হঠাতে না পারলে ঘটবে না। বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাদের সব সময়ই উৎপাদনশীলতার হার বাড়াবার চেষ্টা করতেই হয়। এটা বোঝার জন্য আমাদের বিদেশের দিকে তাকাবার দরকার নেই। ভারতের অটোমোবাইল ক্ষেত্র যে চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখছে তার কারণ সমস্ত দেশীয় উদ্যোগগুলি এই ক্ষেত্রের (অটোমোবাইল) উৎপাদনশীলতা বাড়াবার সফলচেষ্টা করেছে।

একটা নির্দিষ্ট স্থানে বা চিহ্নিত বড় জায়গায় নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকে সংগঠিত করতে পারলে সব উদ্যোগগুলিই (firms) নিজেদেরকে বাড়াবার চেষ্টা করে। এই সূত্রে সরকার একগুচ্ছ করে উৎপাদন ক্ষেত্র (manufacturing clusters) তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে উৎপাদিত পণ্য পরিবহণের অসুবিধে লাঘব করে সংলগ্ন বন্দরকে ব্যবহার করে দ্রুত রপ্তানি করা যায়। এক গুচ্ছ একই ধরনের কারখানা একজায়গায় থাকলে উৎপাদন খরচও কম পড়ে। সেই সঙ্গে পরিবহণ খরচও বন্দরের কাছে হওয়ায় অনেক কমে।

২০১১-১২ সালে ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রের শ্রমশক্তির ৭২ শতাংশ নিযুক্ত ছিল এমন সব কোম্পানিতে যেখানে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জনের কম। কিন্তু সমগ্র উৎপাদিত

**“বিশ্বব্যাপী পণ্যের শুদ্ধতার বা গুণমানের মানদণ্ড কখনই স্থির নয়, তা বিবর্তনশীল। উৎপাদক সংস্থাগুলি সময়ে সময়ে তার সঙ্গে যেমন খাপ খাইয়ে তাদের পণ্যের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখবে তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ এই সংক্রান্ত সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা উৎপাদকদের নজরে আনবে। এটা করতে পারলেই বিশ্বের বিশাল রপ্তানি বাজারের সঙ্গে (value chain) ভারত পুরোপুরি অংশীদার হতে পারবে।”**

সামগ্রীর মাত্র ১২ শতাংশ ছিল এই ছোট ক্ষেত্রগুলির মোট উৎপাদন। এই উদ্যোগগুলি যা MSME (Medium Small Micro Enterprise) নামে পরিচিত এদের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ, জমির ব্যবস্থা করা থেকে শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ করার ক্ষেত্রের নানান অসুবিধেগুলি ইতিমধ্যেই দূর করার ফলে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার মানোন্নয়ন করা অবশ্যই সহজ হবে।

Trading accross border অর্থাৎ সীমান্ত অতিক্রম করে ব্যবসা করা (সহজভাবে রপ্তানি) যা সামগ্রিকভাবে ব্যবসা করার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি। সেই ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৯০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪৬তম। এই সীমান্ত পেরিয়ে ব্যবসা করার মধ্যে পড়ে কী ধরনের কাগজপত্র তৈরি করে সীমান্ত পেরোতে হয়, কতটা সময় লাগে, স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থায় কী কী পদ্ধতি মেনে মাল পাঠাতে হয় ইত্যাদি। ২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী এক দেশ থেকে আর এক দেশের সীমান্ত পেরিয়ে রপ্তানির ক্ষেত্রে চীনের যা গড় সময় লাগে আমাদের তার চেয়ে চার গুণ বেশি লাগছে।

আমরা কিন্তু এই সীমান্ত সংক্রান্ত ও বন্দরে পৌঁছনর পর যে খরচ লাগছে (অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষার) তা সামান্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে অনেকটাই কমাতে পারি। প্রথমত আমাদের বন্দরগুলির মধ্যে Digitisation চালু করা। দ্বিতীয়ত একটু টেকনিকাল হলেও বোঝা দরকার এখনকার নন ইলেকট্রনিক্স ডাটা ইন্টারচেঞ্জ সম্বলিত বন্দরগুলিকে ইডিআই পোর্ট-এ রূপান্তরিত করতে পারলে অত্যন্ত দ্রুততায় পণ্যের খালাস ব্যবস্থা লাগু হতে পারে।

এই সূত্রে রাজ্য সরকারগুলিরও দায়িত্ব থেকে যায়। তাদের হাতে 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের'-সঙ্গে যুক্ত অনেক বিষয়ই রয়েছে। তারাই তো কারখানায় বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় জলের সংযোগ দেয়। তারাই জমি ও অন্য সম্পত্তির নথিবদ্ধকরণ করে থাকে। বোঝা যাচ্ছে ভালোভাবে সংস্থা চালাতে গেলে রাজ্যকে পাশে পেতেই হবে। নানান বিশ্লেষণ ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে সমস্ত রাজ্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে অংশ নেয় ও একই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত তারাই তুলনামূলকভাবে যারা কোনও রপ্তানি বাণিজ্যেই অংশ নেয় না সেইসব রাজ্যের থেকে সম্পদশালী। তাই রাজ্যকেও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। এর প্রথম ধাপটি হচ্ছে রাজ্যে ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো। যার আবার অংশ হচ্ছে সুস্থ বাতাবরণ, digitisation-এর ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামো শক্তিশালী করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডকে মেনে চলাটাই বর্তমানে বাণিজ্য ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক এই সূত্রে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থির করে দিচ্ছেন। এই মানদণ্ড অনুযায়ী চললে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে বাড়তি সুবিধে হবে।

এতদিন নির্দিষ্ট মানদণ্ড কী ও কীভাবে তা অর্জন করা যায় জানা না থাকায় কৃষিজাত পণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের মার্কিনদেশে, ইউরোপে ও জাপানে রপ্তানি করা সম্পূর্ণ মার খেয়েছে। তারা এই সমস্ত দেশের সম্ভাবনাময় বাজারগুলিতে ঢুকতেই পারেনি। বিশ্বব্যাপী খাদ্যের পরিশুদ্ধতার (sanitary) ক্ষেত্রে দেশে যথাযথ মান ঠিক রাখতে পারলে ভারতীয় খাদ্যপণ্য সংক্রান্ত উৎপাদন বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী পণ্যের শুদ্ধতার বা গুণমানের মানদণ্ড কখনই স্থির নয়, তা বিবর্তনশীল। উৎপাদক সংস্থাগুলি সময়ে সময়ে তার সঙ্গে যেমন খাপ খাইয়ে তাদের পণ্যের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখবে তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ এই সংক্রান্ত সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা উৎপাদকদের নজরে আনবে। এটা করতে পারলেই বিশ্বের বিশাল রপ্তানি বাজারের সঙ্গে (value chain) ভারত পুরোপুরি অংশীদার হতে পারবে।

এই রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এলেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেই দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শক্তিশালী হয়ে উঠবে দেশ। ■

# রম্যরচনা

## নবান্নে দিদির ভাষণ

আজ বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের জন্মদিন। আমি গরমেন্টের পক্ষ থেকে জন্মজয়ন্তী পালন করছি। আপনারা সবাই জানেন বর্তমান রাজ্য সরকার রবি ঠাকুরের অজানা তথ্যগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আমি সুব্রতদাকে এর দায়িত্ব দিয়েছি আর সুব্রতদাকে হেল্প করার জন্য বেচারাম আছে। আপনাদের সবার মনে আছে হয়তো কয়েক দিন আগে এই রকম একটা অজানা তথ্য আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছিলাম। সেটা হলো শেক্সপিয়ার আর রবি ঠাকুরের কবিতা নিয়ে আলোচনা। তিনি এতো দেশে বিদেশে ঘুরেছেন বলেই তাঁকে বিশ্বকবি বলা হয়। আমি তাঁর খুব ভক্ত। আমি তো নবান্নে বসে গঙ্গার দিকে যখন তাকিয়ে থাকি তখন প্রায়ই গুনগুন করে তাঁর 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটা গাই। তাঁর বিভিন্ন দিক ছিল যাকে বলে বহুমুখী প্রতিভা। আমি আর মানিকদা ছাড়া এরকম মানুষ বাংলাতে আর আবির্ভূত হয়নি। কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন! যখন বেলেঘাটায় গান্ধীজী অনশন করেছিলেন উনি গান গেয়ে, ফলের রস খাইয়ে তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। কতো সুন্দর সুন্দর গান লিখেছেন! এরপর রাজ্যের সব শ্মশানেও এই গান বাজানো হবে। কোন কোন গান বাজবে আমি তার তালিকা বানিয়ে দেব। আমি আরও একটা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি, রবি ঠাকুর মারা যাবার পর থেকে আর কোনো রবীন্দ্র সঙ্গীত লেখা হয়নি বা সুর করা হয়নি। বাম সরকার গত ৩৪ বছরে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগও নেয়নি। এটা একটা দায়িত্বহীন কাজ। আমি অরূপ আর কাননকে বলেছি দেব, দেবশ্রী, মুনমুন আর সন্ধ্যাদিকে নিয়ে একটা কমিটি করতে যারা নতুন ভাবে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' লেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। এই মা-মাটি-মানুষের সরকার এরকম করে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে হারিয়ে যেতে দেবে না। ধন্যবাদ, সবাই ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর বেশি করে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনবেন।

# উবাচ

"যাঁর ভারত সম্পর্কেই সম্যক ধারণা নেই, তিনি কখনও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বুঝতে পারবেন না।"

**অরুণ কুমার**
সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ

***কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর লন্ডনে সঙ্ঘকে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে***

"যদি কোনও প্রবাসী ভারতীয় বিশ্বের কোথাও বিপদে পড়েন, যদি তাঁর ভারত সরকারের ওপর ভরসা থাকে, তবে সাহায্যের জন্য দরকার একটিমাত্র টুইট।"

**সুষমা স্বরাজ**
**ভারতের বিদেশমন্ত্রী**

***ভিয়েতনামে একটি ভাষণে***

"মসজিদের মাইকে আজানের শব্দ তীব্র, এমনটা বললে তা ধর্ম অবমাননা হিসেবে গণ্য করা যায় না। বরং এমন অভিযোগকে মুসলমান সমাজের গঠনমূলক সমালোচনা হিসেবেই দেখা উচিত।"

**রবিকিন এমহাস**
মুসলমান সংগঠন নাহদাতুল উলামারের আইন বিভাগের প্রধান

***ইন্দোনেশিয়ায় মসজিদের মাইকে আজান ছাড়া অন্য কিছুর প্রচারে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে***

"নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।"

**রবিশঙ্কর প্রসাদ**
কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

***আর্জেন্টিনার সালনায় জি-২০-র প্ল্যান অধিবেশনে ভাষণে***

# মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাঙ্গা বাধাতে চাইছেন মানুষ কিন্তু সব দেখছে

**প্রীতীশ তালুকদার**

আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু অনাথ আতুর আশ্রয় পেয়েছে। কী বললেন? পায়নি! কেন? আপনার বিশাল বড় এক বা একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট, শপিংমল, গাড়ি, জমি, সম্পদ, অনেক টাকা। পোড়া দেশ এটা। তাকিয়ে দেখুন, কত মানুষের মাথা গোঁজার ঘর তো দূরের কথা, পা রাখার সামান্য জমিটুকুও নাই। বেকার, হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষে ছেয়ে আছে। কতটুকুই বা দরকার আপনার? ওদের একটু স্থান দিলে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়, দুটো খেতে পায়, ছেলে- মেয়েদের লেখা-পড়া করিয়ে একটু মানুষ করতে পারে, রোগ-ভোগে ডাক্তার-ওষুধ পায়। আপনি বড় হৃদয়ের মানুষ, দয়ালু। মানবতা আপনার ধর্ম। ভিটেহারা, কর্মহারা, ছন্নছাড়া হতদরিদ্র মানুষগুলোর জন্য আপনি কাঁদেন, রাস্তায় নেমে চিল-চিৎকার জোড়েন আর নিজের দেশের, নিজের রাজ্যের, নিজের শহর বা গ্রামের, নিজের বাড়ির পাশের অভাবি মানুষটার জন্য ওটুকু করতে পারেন না!

ভারতমাতার কুলাঙ্গার সন্তানের দল! ওই বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট, শপিংমল, জমি, সম্পদের মতো এ দেশটা তোমার নয়, তাই এসো যত বাংলাদেশি পাকিস্তানি মোল্লা আগ্রাসী অনুপ্রবেশকারীর দল। এই নাও রেশনকার্ড, আধারকার্ড, ভোটার কার্ড। যা খুশি কর, শুধু ভোটটা দাও, আর সভার মাঠ ভরাও। প্রয়োজনে এক ইশারায় বোমা-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। নিজের দেশেই কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতেরা ভয়ংকর খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ছিন্নমূল জীবন কাটাচ্ছে, ওদের জন্য তোমার মানবতার দরজা বন্ধ, বন্ধ প্রতিবাদের গলাটাও। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মোল্লা আর রোহিঙ্গাদের জন্য তোমাদের মানবতা উথলে উঠছে, চোখের জল বাঁধ মানছে না, দিন-রাত এক করে চিৎকার করছে! কোন ধান্ধায়?

সামনে ২০১৯। বাজার গরম, তার উপর অসমে শেষ সমীক্ষা অনুসারে নাগরিকপঞ্জির খসড়ায় সে রাজ্যের চল্লিশ লক্ষ মানুষ অবৈধ বাংলাদেশি চোরাপথে সীমা পার করে ভারতে ঢুকে বসবাস করছিলো, তারা অনুপ্রবেশকারী রূপে চিহ্নিত। এরা ভারতের নাগরিক নয়। এদের নিয়ে কী কর্তব্য? চুপি চুপি আপনার বাড়ি, জমি-জায়গা দখল করে কেউ বসবাস ও ভোগ করা শুরু করলে আপনি যা করেন সেটাই কর্তব্য নিশ্চয়ই। সেটা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের না-পছন্দ। ১৯৪৬-এ মুসলিম লিগ নেতা জিন্না পাকিস্তান আদায়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামটা কী? জিন্না বলল, মুসলমানরা ঠিক বুঝে যাবে। ঠিকই বুঝেছিল। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে। সমঝদার ঠিক বুঝে গেছে বার্তা, যেমন বুঝেছিল রামনবমীর সময়; অপেক্ষা সেই ক্রিয়ার।

'বেআইনি ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক'— প্রায়শই সংবাদে দেখা যায়। অনুপ্রবেশ করে ভোটারকার্ড, রেশনকার্ড, আধার কার্ড, এমনকী পাশপোর্ট বানিয়ে নিয়েছে এমনও ধরা পড়ছে। সৌজন্যে রাজনীতির দাদারা। এই জলজ্যান্ত প্রমাণ বাস্তব অনুপ্রবেশের তুলনায় অতি নগণ্য। বিজেপি ও সঙ্ঘ অনুরাগীরা ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের বিরোধী। তারা চার দশক ধরে চিৎকার করছে। লুকোছাপাও নেই, চক্রান্তও নেই। যদিও সঠিক পরিসংখ্যান নেই তবুও প্রায় দেড় কোটি অবৈধ বাংলাদেশি পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করে এই দুই রাজ্যেই সিংহভাগ বাস করছে ও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। ৬১ সালে ২০.০০ শতাংশ, ৭১ সালে ২০.৬৪ শতাংশ, ৮১ সালে ২১.৫১ শতাংশ। অর্থাৎ প্রথম দশ বছরে ০০.১৫, পরের দশ বছরে ০০.৬৪, পরের দশ বছরে ০০.৮৭ শতাংশ এবং এই ত্রিশ বছরে মোট বৃদ্ধির হার ০১.৬৬ শতাংশ। প্রথম দশ বছরে ০০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি অধিক জন্মহারের কারণে হতে পারে। কিন্তু পরের দশকগুলিতে ক্রমশ তা বাড়তে শুরু করেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উদাসীনতা যত প্রকাশ পেয়েছে ততই এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়া মুসলমানেরা ও অন্য মুসলমানেরা ফের এপারে এসে বাস করতে শুরু করেছে। ১৯৯১-এর চিত্রটা হঠাৎ চোখে পড়ার মতো। গত তিন দশকে যেখানে প্রতি দশ বছরে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ০০.৮৭ শতাংশ সেখানে ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ এই দশ বছরে সেটা হঠাৎ প্রায় তিন গুণ ০২.১০ শতাংশ অর্থাৎ গত ত্রিশ বছরের চেয়েও বেশি।

জন্মহারের স্বাভাবিক একটা ছন্দ আছে। তা ছাড়া এই দশকেই সারা ভারত ব্যাপী

**দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে, রক্তগঙ্গা বইবে বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতোই কাজ করেননি, এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ উস্কানি দিয়েছেন।**

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাতে জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হবার কথা। তা ছাড়াও এই সময় ধরে বিশাল পরিমাণ নির্যাতিত বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থী এসেছে। এখানকার হিন্দুর জন্মহার ও শরণার্থীদের যোগফলকে হারিয়ে মুসলমানের অধিক বৃদ্ধি কম কথা নয়। তাই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এই দশকে ব্যাপক হারে বাংলাদেশি মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বাংলাদেশ সীমাবর্তী জেলাগুলির কিছু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, আর কিছু হবার পথে। যেখানে দেশের জাতীয় সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা প্রচণ্ড হারে বেড়ে চলেছে। জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। দুই প্রতিবেশী দেশ-প্রেরিত ও উৎসাহিত সন্ত্রাসে প্রতিনিয়ত জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে রক্ত ঝরছে। কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্ব চরমে, সেখানে দেশের ঘোষিত শত্রুদের ঘরে আশ্রয় দেওয়া নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা।

দ্রুত জন্মহার দেশটাকে জনবিস্ফোরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের সম্পদ ও উৎপাদনের সঙ্গে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য না থাকলে ভয়ানক অভাব ও অরাজকতা দেখা দেবেই। দেশ পিছনের দিকে ছুটবে, দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে দেখা দিচ্ছে কর্মসংস্থানের অভাব ও চরম বেকারত্ব। এই পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশকারীরা দেশবাসীর হাতে কাজ, মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে ও নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা। ভারত সন্ত্রাস কবলিত দেশ, আর এই সমস্ত সন্ত্রাসের উৎস প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। আরও পরিষ্কার করে বললে ইসলামিক জেহাদের জঙ্গিপনা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জিহাদি গোষ্ঠীগুলো যেমন সেদেশ থেকে জঙ্গি রপ্তানি করছে তেমন এদেশেও জঙ্গি সংগঠন সৃষ্টি করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ও নাশকতা ঘটাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলো ভারতবিরোধী চক্রান্ত, জঙ্গি তৈরি ও আশ্রয়, চোরাচালানের আতুড়ঘর। এরা ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তির শত্রু। তৃতীয়ত, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির মাধ্যমে এরা রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, নিজেরাও রাজনীতির ক্ষমতায় পৌঁছে যাচ্ছে, সঙ্গে সেনা, পুলিশ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রেও প্রবেশ করছে যা ভয়ানক পরিণাম ডেকে আনবে। যারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধদের উপর খুন-ধর্ষণ, মন্দির-প্রতিমা ভাঙা, সম্পত্তি দখল ইত্যাদি নির্মম অত্যাচার চালিয়ে নিঃশেষ করে চলেছে।

২০১২ সালে অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় যার মূলে এই অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা আগ্রাসন, খুন ও নির্মম ধর্ষণ। সেই সময় অসমের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের থেকে রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য দেশের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। দীর্ঘ শুনানির পর ২০১৪ সালে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত অসম সরকারকে নির্দেশ দেয় অসমের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাতে হবে। বাহান্ন হাজার সরকারি কর্মী তিন বৎসর ধরে সমীক্ষার পর অসমের প্রকৃত নাগরিকের তালিকা প্রকাশ করেছে। নাগরিকদের তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক আবেদনের ভিত্তিতে সংযোজন ও বিয়োজনের রাস্তা পুরো খোলা এখনও। সেসব শেষ হলে সিদ্ধান্ত হবে অবৈধদের নিয়ে কী করা হবে।

একটা সহজ হিসাব আছে; বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মানেই মুসলমান আর মুসলমান মানেই বিজেপি বিরোধী ভোট। অসমের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী এনারসি'র কৃতিত্ব দাবি করেছেন, কর্ণাটকের কংগ্রেসি উপমুখ্যমন্ত্রী এন. আর. সি.-র দাবি করেছেন তাই কংগ্রেসের ছুঁচো গেলা অবস্থা। সেই সঙ্গে মুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ ও অসম থেকে তাদের আর কোনো আশা নেই। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল অসম ও ত্রিপুরায় ঢুকতে চায়। মমতা ব্যানার্জি মনে করেন অসম যেহেতু বিজেপির দখলে তাই সেখানের বিশাল মুসলমান ভোটারদের টেনে বিরোধী দল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর কংগ্রেস বাস্তবে নেই, বামফ্রন্ট কাগজে সীমাবদ্ধ অনুপ্রবেশকারীরা বিজেপিকে হারাতে একচেটিয়া ভাবে তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরবে। ত্রিশ শতাংশ মুসলমানের রিজার্ভ ভোটব্যাঙ্ক থাকলে সঙ্গে হিন্দু ভোটের কিছু ভাগ বসালেই তার সিংহাসন অটল। মোটামুটি ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সংখ্যা আড়াই কোটি। তার মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর এই ন'টা জেলাতেই তাদের সংখ্যা প্রায় দু'কোটি। অর্থাৎ রাজ্যের অর্ধেক লোকসভা ও বিধানসভা আসন মুসলমান ভোট নির্ভর। এ রাজ্যের মানুষ প্রবল ভাবে বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। পশ্চিমবঙ্গেও যদি ষাট-সত্তর লাখ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর ভোট বাদ পড়ে যায় তাহলে স্থানীয় মুসলমানরাও পাশ থেকে সরে যাবে।

২০০৫ সালে এই ভোট ছিল বামফ্রন্টের। তাই এই মমতা ব্যানার্জি তখন অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন লোকসভায় তুলকালাম করেছিলেন। এখন তাঁরাই তৃণমূলের সম্পদ। এর পর অনুপ্রবেশকারী হটাও শুরু হতে পারে। ওদের না রাখতে পারলে, অসমের অবৈধ মুসলমানদের হয়ে গলা না ফাটালে বিজেপির বাড়বাড়ন্তে এ রাজ্যেও তার জন্য আমড়ার আঁটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই দায়েই মুসলমান দরদ, বাঙালি সেন্টিমেন্টে উস্কানি, মিথ্যা প্রচার, মানবতার দোহাই। এত দরদ আর মানবতা তো বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন অত্যাচারিত হয়ে দেশ ছেড়ে এসে বৈধ ভাবে আবেদন করেও আশ্রয় পাননি কেন?

শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী গুলিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা চলছে, মানবতার দোহাই পাড়া হচ্ছে। প্রশ্নও করা হচ্ছে— পুশব্যাক করবে কোথায়? সব বিজেপি'র চক্রান্ত। বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের প্রকাশ্য বিরোধী। দেশ ও দেশের স্বার্থে ন্যায়ালয়ের আদেশ বিজেপি ও সঙ্ঘ অনুরাগীদের এত দিনের দাবিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সত্য চেপে গিয়ে বাঙালি ধুয়ো, মতুয়া ধুয়ো, মানবতার ধুয়ো, বাঙালি বিতারণের মিথ্যা গল্প ফেঁদে মানুষ খেপিয়ে তোলাদের কী স্বার্থ? দেশের নিরাপত্তা, আইন, দেশের ও রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের স্বার্থের চেয়ে গদিটা আগে, গদির জন্য ভোটটা আগে? তার জন্য দেশ, সংবিধান, আইন, রাজ্যের জনতা চুলোয় যাক। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল সাংবিধানিক পদে থেকে অসংবিধানিক অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করা এবং সংবিধান ও ন্যায়ালয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলা অপরাধ। দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে, রক্তগঙ্গা বইবে বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতোই কাজ করেননি, এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ উস্কানি দিয়েছেন। ম্যাডাম, আপনি খাগড়াগড়ের কীর্তি দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংস্থা 'র'-এর উপর চাপিয়েছিলেন। বেরিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ, জামাত, মুকিমনগর, ডোমকল, লালগোলা, বেলডাঙ্গা। রাজ্যের মানুষ কিন্তু সব দেখছে। ■

# অজাতশত্রু রাষ্ট্রসাধক অটলবিহারী বাজপেয়ী

**তরুণ বিজয়**

অটলজীর বিষয়ে কিছু লেখা খুবই কঠিন। যেমন গঙ্গার প্রবহমান ধারার বর্ণনা শব্দাতীত হয়। কঠোর হয়েও নরম, প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়েও সম্পর্কে বন্ধুত্বের শালীনতা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেও ভাষায় সংযম ও শ্রুতিমধুরতা। খুব উচ্চ হয়েও দূর্বাদলের মতো বিনম্র অটলজীর উদাহরণ শুধু অটলজীই। বড় কথা যে, তাঁর হৃদয় খুব বড়। তাঁর প্রিয়বাক্য--- 'মতভেদ হতে পারে, মনোমালিন্য নয়'। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় ওঠা-বসা ও প্রবাস করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে আর কিছুর দরকার নেই। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মন দিয়ে কথা শুনেছেন। যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তিনি অপার আনন্দ পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, অটলজী তাঁর কথা শুনেছেন। আজ সংগঠন ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পীড়া ও বেদনার বিষয় হলো যে, সবাই শোনাতে চায়, শুনতে কেউ চায় না।

আমি একবার অটলজীকে বলি যে, আপনার সঙ্গে দিল্লি থেকে মথুরা দীনদয়ালধাম পর্যন্ত চার ঘণ্টা প্রবাস করার সুযোগ হয়েছিল। অনেক কিছু শোনানোর জন্য শুধু আমিই বকবক করেছি। আপনি একটি কথা না বলে সব শুনছিলেন। এত ধৈর্য আপনি পেলেন কোথা থেকে? অটলজী খুব জোরে হেসে বললেন— ''তুমি তো মনের কথা বলেছ। শুনলে অনেক কিছু পাওয়া যায়ই। যেটা ভালো মনে হয়েছে রাখো, বাকিটা ছেড়ে দাও''। তিনি তাঁর মারাত্মক প্রতিপক্ষকেও ব্যক্তিগত আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আমরা সোনিয়াজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সমালোচনা করে *'পাঞ্চজন্য'* পত্রিকায় কড়া ভাষায় লিখতাম। এরকম একটি সংখ্যা দেখে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেই ফোন করে বলেন--- ''বিজয়, নীতি ও কার্যক্রমের ওপর আঘাত করো, ব্যক্তিগত আক্রমণ পত্রিকার বাইরে রাখলেই ভালো''। একবার আমরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সংখ্যা বের করি। যার প্রচ্ছদে কাশীর ডোমরাজার সঙ্গে সাধুসন্ত, শঙ্করাচার্য এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎকালীন সভাপতি অশোক সিংহলের ভোজন করার চিত্র ছাপা হয়েছিল। অটলজী এটা দেখে খুবই প্রসন্ন হন এবং বলেন, ''এরকম যত বেশি প্রচার-প্রসার হবে ততই মঙ্গল। আর এরকম মন থেকে হওয়া প্রয়োজন, ছবি-টবির জন্য নয়।'' তিনি পাঞ্চজন্য-র প্রথম সম্পাদক ছিলেনই, প্রথম পাঠকও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এক একটা সংখ্যার জন্য তাঁর মন্তব্য আমরা পেতাম। একবার স্বদেশী বিষয়ে পত্রিকার এক সংখ্যায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো ভারতমাতার চিত্র দেখে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন— ''আমরা বেঁচে থাকতেই এরকম দৃশ্য আঁকা? আমরা কি মরে গেছি নাকি? সংযম ও শালীনতা বিহীন সাংবাদিকতা হতে পারে না।''

পঞ্চাশের দশকে নেহরুবাদী মানসিকতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও শ্রেণীর ওপর এক প্রকার বৈচারিক অস্পৃশ্যতার হামলা চলছিল, তখন অটলজীর সম্পাদনায় পাঞ্চজন্য, রাষ্ট্রধর্ম, স্বদেশ প্রভৃতি পত্রিকা বের হতো। তখন খুবই সংঘর্ষের দিন ছিল। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই দিনগুলিতে তিনি খুবই পরিশ্রম করে কাজ করতেন। তখন তিনি লিখেছেন—

বাধায়েঁ আতি হ্যাঁ আয়েঁ, ঘিরে প্রলয় কি ঘোর ঘটায়েঁ

পাঁয়োঁ কে নীচে অঙ্গারে, সিরপর বরসেঁ যদি জালায়েঁ

নিজ হাথোঁ মেঁ হঁসতে-হঁসতে, আগ লগাকর জলনা হোগা

বাম প্রতিনিধি জ্যোতি বসু ও অসীম দাশগুপ্তের সঙ্গে অটলজী। রয়েছেন যশবন্ত সিংহও।

> যদি প্রতিক্রিয়াবশত হিন্দুত্বের প্রতি গর্ব অনুভব হয়, তবে এটা খুব ভালো লক্ষণ নয়। যদি মানুষ প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু হয়ে যায়, তবে অন্য লোকেরা আরও কট্টর হয়ে যাবে। গঠনমূলক তত্ত্বের ভিত্তিতেই বর্তমানের এই সংশয় দূর করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

কদম মিলাকর চলনা হোগা।

যখন তিনি ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন, তখন আমি তাঁকে বলি যে, সব কিছুর মতো সরকার বিভিন্নযাত্রাকে সহায়তা করে; কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রাতেও সরকারের সাহায্য পাওয়া উচিত। তিনি বলেন— 'তুমি খুব তাড়াতাড়ি চিঠি লেখো, আমি কিছু করবো।' আমি হাতে লিখেই সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দিলাম। তখন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন বিশন ট্যান্ডন। সেই চিঠি সে সময় লোকসভায় পাঠানো হয় যখন অটলজী ইস্তফা দেওয়ার জন্য তৈরি। সে অবস্থাতেই তিনি হস্তাক্ষর করে যে অনুদান মঞ্জুর করেন তা আজও চলছে। পরে অনেক রাজ্য সরকারও অনুদান আরম্ভ করে।

যখন তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন তখন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। পোখরান-২ বিস্ফোরণ এরকম একটা চমকপ্রদ মুহূর্ত ছিল। আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশেরও মাথা ঘুরে যায় ও নাজেহাল হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়া নিষেধাজ্ঞা লাগালেও অটলজী কাউকে পরোয়া করেননি। আমেরিকা সুপার কমপিউটার দিতে অস্বীকার করলে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিজয় ভাটকরকে উৎসাহ দিয়ে ভারতেই সুপার কম্পিউটার বানিয়েছেন। ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন পাওয়া না গেলে ভারতেই তা নির্মাণ করিয়েছেন।

কার্গিলে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার পরও আগ্রা শিখর সম্মেলন তাঁর আত্মবিশ্বাসেরই দ্যোতক ছিল। ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বিপ্লব, মোবাইল, টেলিফোনের দাম কমিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া, ভারতের আদিঅন্ত সোনালি চতুর্ভুজ রাজপথে যুক্ত করা এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়ে ভারতকে অধিক সৈন্য-সক্ষম তৈরি করা অটলজীর বীরত্ব ও বিকাশ-কেন্দ্রিক নীতির এক উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে। তিনি শেষ ব্যক্তিটিরও দারিদ্র্য দূর করার জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন ও গান্ধীজীর চিন্তনে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এজন্য ভারতীয় জনতা পার্টি নির্মাণের পর তিনি গান্ধীবাদী সমাজবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

অটলজীর ব্যক্তিত্ব এক এমন স্বয়ংসেবকের পুণ্যপ্রবাহের প্রতিবিম্ব যাঁর কলম থেকে নির্গত হয়েছে— 'গগন মেঁ লহরাতা হ্যায় ভগবা হমারা', 'রগ-রগ হিন্দু মেরা পরিচয়' এবং 'কেশবকে আজীবন তপ কি য়হ পবিত্রতম ধারা...সাঠ সহস হি ইসসে ভারত সারা'। 'হিরোশিমা কি বেদনা' এবং 'মনালি মত্ জহয়ো' তাঁর কবি হৃদয়ের বেদনা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশিত করে। আবার দুঃখ-কষ্ট ঘেরা এরকম সময় আসে তখনও তিনি ভেঙে পড়েন না, কবিসত্তার তার ছিঁড়ে যায় না।

১৯৯৪ সালে রজ্জু ভাইয়া আগ্রহভরে আমার পুস্তক 'কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা— সাক্ষাৎ শিব সে সংবাদ' প্রকাশ করার ইচ্ছায় বলেন— এর উদ্‌ঘাটন অটলজীর হাতে করাও। আমি অটলজীকে এ বিষয়ে বললে তিনি বলেন— আমি তো আছিই। রজ্জু ভাইয়া বলেছেন, আমি করে দেব। কিন্তু আমার ইচ্ছা এমন কাউকে দিয়ে করাও যিনি বিদ্বান ও রাষ্ট্রভক্ত। আমি বললাম— কীরকম? তিনি তাঁর চিরাচরিত স্বভাবে এক মুহূর্ত থেমে বললেন— 'ড. কর্ণ সিংহ। তাঁকে ডাকো।' আমি বলি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তিনি তাঁর সচিবকে কর্ণ সিংহের ফোন লাগাতে বলেন। ফোনে ড. কর্ণ সিংহকে পুস্তক লোকার্পণের জন্য তিনি নিজেই আমন্ত্রণ জানালেন।

২০০৭ সালের কথা। তখন তাঁর শরীর ভালে নেই। জানতে পেরে আমি ফোন করি। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বলেন— ''দেহ ধরন কো দণ্ড হ্যায় সবকাহু কো হোয়। জ্ঞানী ভুগতে জ্ঞান সে, মূরখ ভুগতে রোয়, এবং হাসতে শুরু করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, অটলজী এটি কার কবিতা? বলেন— ''জানি না, কিন্তু আমার বাবা স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী আবৃত্তি করতেন। এজন্য শরীরের কষ্টে দুঃখী হলে চলবে না।''

১৯৯৬ সাল থেকে লে'তে সিন্ধু দর্শন শুরু করেছি। আদবানীজীর আশীর্বাদ ছিল। সাহিব সিংহ বর্মার উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা ছিলই, রজ্জুভাইয়া ও শেষাদ্রিজীর পথনির্দেশ খুব বড় সম্বল ছিল। আমরা সঙ্কোচবশত অটলজীর হাতে সিন্ধু দর্শনের উদ্বোধন করানোর জন্য বলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। একবার তাঁর ফোন আসে— ''বিজয়, সিন্ধু দর্শন উৎসব একা একাই করবে? আমি এখনো নিমন্ত্রণ পাইনি।'' আমরা তাঁর অভিযোগে গদগদ হয়ে গেলাম। ২০০১-এ তিনি সিন্ধু দর্শন অভিযানের উদ্বোধন করেন এবং হৃদয় রোমাঞ্চিত করার মতো ভাষণ দেন যা এই উৎসবকে রাষ্ট্রভাবনায় ভরপুর করে দেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন— ''সভ্যতা কলেবর, সংস্কৃতি তার অন্তরাত্মা। সভ্যতা স্থূল, সংস্কৃতি সূক্ষ্ম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বদল হয়, কেননা তার সম্পর্ক পার্থিব জীবনের সঙ্গে থাকে। কিন্তু তার তুলনায় সংস্কৃতি মুখ্যরূপে ভাবজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় অধিক স্থায়ী হয়। যখন বলা হয়, রোম, মিশর, গ্রিক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখন তাদের স্থূলজীবন শুধু নয়, সূক্ষ্মজীবনও নষ্ট হয়েছে।

যে সময় দেশে তীব্রভাবে 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু' পরিবেশ নির্মাণ হয়েছে সে সময় আমি অটলজীর একটি সাক্ষাৎকার নিই। যেটি খুব প্রচারিতও হয়েছে। অটলজী খোলাখুলি বলেন— যদি প্রতিক্রিয়াবশত হিন্দুত্বের প্রতি গর্ব অনুভব হয়, তবে এটা খুব ভালো লক্ষণ নয়। যদি মানুষ প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু হয়ে যায়, তবে অন্য লোকেরা আরও কট্টর হয়ে যাবে। গঠনমূলক তত্ত্বের ভিত্তিতেই বর্তমানের এই সংশয় দূর করার প্রচেষ্টা করতে হবে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এজন্য আমাদের দায়িত্ব বেশি। 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি ভারতীয়' বলতে আপত্তি কোথায়?''

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অটলজীর জন্মদিনকে 'সুশাসন দিবস' রূপে পালন করার ঘোষণা করেছিলেন। সুশাসন বিষয়ে অটলজী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''দেশে সুশাসন খুবই জরুরি। সরকার তার প্রাথমিক কর্তব্য পালন করবে, ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেবে, তাদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করবে— এটাই বড় কথা। গত ৫০ বছরে এই কাজ যে গতিতে হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। মানুষ ভালো ও স্বচ্ছ সরকার চায়। যেখানে শক্তি ও কঠোরতার প্রয়োজন হবে সেখানে আমাদের সরকার শক্তি ও কঠোরতা দেখাবে এবং বুঝেসুঝে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হলে সে পথেই অগ্রসর হতে হবে। আমরা এমন দেশ নির্মাণ করতে চাই যেখানে 'দৈহিক, দৈবিক, ভৌতিক তাপা, রামরাজ কাহূ নহি ব্যাপা' ফলপ্রসূ হবে। খাদ্যের ক্ষেত্রে সুরক্ষা আসাও আমাদের বড় উপলব্ধি। এখন অনাহারে মারা যাওয়ার খবর নেই। অন্ত্যোদয় যোজনায় দু'টাকায় গম ও তিন টাকায় চাল দেওয়া হচ্ছে। লোকের অবস্থা ভালো হওয়ার জন্য লোকেরাও কম নিচ্ছে। অটলজী কিন্তু অটলজীই। অতুলনীয়। আজকের পরিবেশে ব্যাপ্ত রাজনৈতিক কলুষতায় তাঁর কথা সবার খুব মনে পড়ছে। একথা খুবই সত্য যে তিনি বর্তমানকালের অজাতশত্রু। তিনি শুধু ভারতের আরাধনা করেছেন। এজন্য তিনি বলতে পারেন, আমার আস্থা— ভারত।

*(লেখক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য)*

*(রচনাটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো)*

# জননেতা ও রাষ্ট্রনায়ক অটলবিহারী বাজপেয়ী

**ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়**

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে জাতীয় রাজনীতিতে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রনায়কের পর্যায়ে উত্তরণ হয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর। তিনি জাতীয় কংগ্রেস দলের বাইরে একটি অকংগ্রেসি দলকে সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় রাজনীতির অভিমুখে পরিণত করেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনিই ছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আর তার দেড় দশক পরেই দলটি সংসদে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। ১৯৯৬, ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০৪ তিন দফায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে শিখরে পৌঁছেছিলেন। নিছক পেশাদারি রাজনীতিবিদ নন, রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন।

স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন (১৬ আগস্ট) অপরাহ্নে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ বাক্‌শক্তিহীন অটলবিহারীর নয়দশকের বেশি জীবনের অবসান ঘটল। প্রয়াত অটলবিহারীকে নতুন দিল্লির এমস্ হসপিটাল থেকে তাঁর কৃষ্ণমেনন মার্গের বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। পরদিন ১৭ আগস্ট বিশাল শোকমিছিল-সহ অন্তিম যাত্রা বের হয়। যমুনা কিনারে শক্তি স্থলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মৃতদেহ সৎকার হলো। বিগত কয়েক বছর সুবক্তা অটলবিহারী বাক্‌রুদ্ধ পঙ্গু অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন, তাই তিনি কার্যত নীরব দর্শক হয়ে শেষ প্রহরের দিন গুনছিলেন।

প্রায় ছয় দশক অটলবিহারীর রাজনৈতিক জীবন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছিল। যাত্রা শুরু সেই ১৯৫১ সালে। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে তরুণ অটলবিহারী বিকল্প রাজনীতির

পোখরানে অটল বিহারী বাজপেয়ী।

স্রোতে যুক্ত হন। প্রবাদ প্রতিম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন। লেখালেখি, সাংবাদিকতার কাজকর্মে নিবদ্ধ হন। পাঞ্চজন্য পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। বত্রিশ বছর বয়সে জনসঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে সংসদীয় জীবনের শুরু হয়। কুশলী সাংসদ হিসাবে তখন থেকেই নজর কাড়েন। জনসঙ্ঘ নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন। জনসঙ্ঘের সম্পাদক হিসেবে দলীয় রাজনীতিতে কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেন।

অটলবিহারীর রাজনৈতিক জীবনে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ ও প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। ১৯৬৭ সাল থেকে জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতার রাজনীতির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় আর অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। মহাভারতীয় মূল্যবোধ থেকে সরে এসে জাতপাত ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ রাজনীতি জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে তুলল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতাসীন হলো। এই ভঙ্গুর পরিবেশে ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা করলেন। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র ও মূল্যবোধের রাজনীতির অবক্ষয় শুরু হলো।

তারপর এল সেই কালবেলা। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার ঘোষণা সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশজোড়া আন্দোলনে হাত মেলাল জনসঙ্ঘ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বেআইনি ঘোষিত হলো। জয়প্রকাশের সঙ্গে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ বহু নেতা কারাবন্দি হলেন। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্দিরা নির্বাচনের ডাক দিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিরোধী নেতারা নিজ নিজ দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে জনতা পার্টি গঠন করলেন। এই ভাবেই ভারতীয় জনসঙ্ঘ জনতা পার্টির সঙ্গে মিশে গেল। নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস দল পরাজিত হলেন। মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা সরকার ক্ষমতায় বসল। অটলবিহারী কেন্দ্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে তিনি হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে নজর কাড়লেন। কিন্তু জনতা সরকার দু'বছরের মধ্যেই ভেঙে গেল। চরণ সিংহ ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে সরকার গঠন করলেন। কিন্তু কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করায় চরণ সিংহের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলো। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী

পুনরায় ক্ষমতাসীন হলেন। বিরোধী শিবির যখন উদ্‌ভ্রান্ত, সে সময়ই ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম সভাপতি হলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। বাজপেয়ী জানালেন যে, নতুন দলের প্রধান লক্ষ্য হলো পরিবারতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে জাতীয় রাজনীতির সুরক্ষা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে বেশিমাত্রায় তুলে ধরেছিলেন দলীয় সভাপতি বাজপেয়ী।

কিন্তু অটলজী ও তাঁর দলকে বিরূপ পরিস্থিতির চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সহানুভূতির ভোট চলে যায় ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধীর দিকে। ভারতীয় জনতা পার্টি মাত্র দুটি আসনে জয়যুক্ত হয়। অটলবিহারী স্বয়ং পরাজিত হলেন। হতাশা ও বিষাদ দিয়ে শুরু হলেও, বছর পাঁচেকের মধ্যে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠল। একদিকে বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে বিরোধী দলগুলি সোচ্চার হলো, অন্যদিকে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে বিজেপি আন্দোলনে নামল। ১৯৮৯-এর শেষদিকে রাজীব গান্ধী নির্বাচনে হারলেন আর ভিপি সিংহের নেতৃত্বে জনতা দল ক্ষমতায় বসল। অবশ্য বামদলগুলি ও বিজেপি পেছন থেকে সমর্থন জানাল। ১৯৮৯-এর নির্বাচনে বিজেপি ৮৯টি আসনে জিতে আসে। কিন্তু রামমন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিজেপি সুর চড়া করল এবং সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল।

এরপর গত শতকের নব্বইয়ের দশকে বিজেপি ভারতীয় রাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল। অটলবিহারী বিরোধী দলের নেতা হলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হতে তাঁকে কম ঝামেলায় পড়তে হয়নি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি প্রথম সংসদে বৃহত্তম দলে পরিণত হলো। মন্ত্রীসভা গড়ার ডাক পেলেন। কিন্তু অন্যদলগুলি বিরোধিতার ফলে বিজেপি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেওয়া সত্ত্বেও অটলবিহারী বুঝলেন আস্থাভোটে জেতার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু লোকসভায় বাজপেয়ী যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে অতুলনীয়। তাঁর ভাষায় দল আসবে যাবে, রাজনৈতিক নেতারা ঘুরপাক খাবেন, কিন্তু তাদের কেউ মনে রাখবে না। সবার উপরে দেশ ও ন্যায়নীতি তা অটুট থাকবে।

তেরো দিন প্রধানমন্ত্রী থাকার পর কংগ্রেসের সমর্থনে জোড়াতালি দিয়ে দু'বার সরকারের আগমন ও প্রস্থান হলো। ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ী সরকার গড়লেন। কিন্তু তার আয়ু ছিল তেরো মাসের। বর্তমান পত্রিকায় (১৬ মার্চ ১৯৯৮) যে দুটি খবর শিরোনামে স্থান পেয়েছিল তার একটি হলো রাষ্ট্রপতি অটলবিহারীকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। আর বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর কলামে লিখলেন সোনিয়া গান্ধী 'দৃষ্টিকটু ভাবে' কংগ্রেস সভাপতির পদে বসলেন, আর কংগ্রেসের 'ভেড়ার পাল' নেতারা কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরীকে কার্যত 'ধাক্কা মেরে' উৎখাত করেছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানালেন 'সাম্প্রদায়িকতা'র মেকাবিলা করার জন্য কংগ্রেসকে সরকার গঠনের জন্য সমর্থন জোগাবে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার গঠনের ছক ১৯৯৮ সালেই নেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৮ সালে সরকার গঠনের পর অটলজীর নেতৃত্বে ভারত সরকার পোখরান-টু বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অটল সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অবরোধ উপেক্ষা করে তাঁর নেতৃত্বে ভারত স্বাভিমানের নজির স্থাপন করে। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংঘর্ষের পথ নিতে বিলম্ব করেননি। ১৯৯৯ সালে কার্গিলের যুদ্ধের ভারতের সাফল্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

এদিকে একদলীয় রাজনৈতিক শাসনের দিন ফুরিয়েছে তা অনুভব করে শক্ত ও সুসংহত কোয়ালিশন রাজনীতির নজির স্থাপন করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে পুনরায় ভোটে জিতে পাঁচ বছর একটানা কোয়ালিশন রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর অভাবনীয় অবদান হলো হিন্দুত্ব রাজনীতিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমন্বিত রূপ দিওয়া। আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে আঞ্চলিকতাবাদের সঙ্গে ভারতের অখণ্ড জাতীয় সত্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। এরই প্রমাণ মেলে স্বর্ণ চতুর্ভুজ (golden triangle) পরিকল্পনায়। ভারতের বিভিন্ন মহানগরীকে একসূত্রে গেঁথে তোলার উদ্দেশ্যে এই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগের জন্য গ্রামীণ সড়ক যোজনা কার্যকর হলো। বাজপেয়ীর মূল অবদান হলো রাজধর্মের সঠিক বাস্তবায়ন অর্থাৎ ধর্ম ও ন্যায়-নীতি অনুসরণ করে সকল স্তরের মানুষের কাছে সুশাসন পৌঁছে দেওয়া। তাকে 'বিকাশ পুরুষ' আখ্যা দেওয়া সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ছিল ২০১৪ সালে বিজেপির মূল নির্বাচনী ধ্বনি। অটলবিহারীর ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে এই স্লোগান তুলে ধরা হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে দুজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন নেহরু ও বাজপেয়ী। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি রচিত নেহরু সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম Gentle Colossus (ভদ্র বিশাল ব্যক্তি)। বাজপেয়ী সম্পর্কে একই অভিধা প্রযোজ্য। সব দল ও মতের লোক প্রয়াত বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কেউ কোনো অভিযোগ তোলেননি। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেও বাজপেয়ীর ব্যক্তিত্ব ছিল অমলিন। কিন্তু নেহরুর আমলে ভারত চীনের কাছে পরাজিত হয়েছিল। পোখরান টু আর কার্গিল যুদ্ধে বাজপেয়ী দেখিয়েছিলেন কীভাবে দেশের মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়।

বাংলার মহান সন্তান ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন তরুণ বাজপেয়ী। শ্যামাপ্রসাদের সদর্থক জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে তাঁর মন্ত্রশিষ্য বাজপেয়ী নিপুণভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন। দেশাত্মবোধ ও মানবতাবাদ এই দুইয়ের সমন্বিত রূপ ছিলেন অটলবিহারী। বাজপেয়ী তরুণ বয়সে দিল্লির পাঞ্চজন্য পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। ২০০০ সালের আগস্টে ওই পত্রিকার শ্যামাপ্রসাদ জন্মশতবর্ষ সংখ্যায় অটলবিহারী কয়েক লাইনের কবিতা দিয়ে তাঁর পথনির্দেশক শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ওই সংখ্যায় আমার একটি ছোট প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। ভারতের মহান সন্তান অটলবিহারীর সঙ্গে লেখক সূচিতে আমার নাম দেখে আমি বিমোহিত হয়েছিলাম। যাঁরা বড়মাপের মানুষ সংকীর্ণতার অনেক উপরে অবস্থান করেন, আত্মম্ভরিতা ও অহমিকা তাঁদের স্পর্শ করে না।

*(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস)*

# অটলজী এক বড় মাপের রাষ্ট্রনায়ক

**বিজয় আঢ্য**

দিল্লিতে দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময় যে যজ্ঞ হয়েছিল, সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন এমন শ্রীগুরুজীর একটি ছবি তখন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ছবির তলায় লেখা ছিল— 'রাষ্ট্রায় স্বাহা।' এই ধ্যেয়বাক্যটিই ছিল অটলজীর জীবনাদর্শ। রাষ্ট্র (Nation)- কে পরমবৈভব সম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বের পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর Vision বা দূরদৃষ্টি। ১৯৯৮-এর ১৩ মে পোখরানে পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ 'অপারেশান শক্তি' ছিল তাঁর সেই দূরদর্শিতার ফসল। বহু বছর পর কয়েকদিন আগে হঠাৎই এক জজ-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সম্প্রতি তিনি জজের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। কথায় কথায় তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা জানালেন যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাতের দশকে একবার পনেরোজন আই এস পরীক্ষার্থীদের 'ইন্টারভিউ' বোর্ডে তিনি ছিলেন। সে সময় তাঁর প্রশ্ন ছিল, পোখরানে পরমাণু পরীক্ষা (ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে) কি ঠিক কাজ হয়েছে? সেসময় 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'— স্লোগানের খুব রমরমা ছিল। একজন মহিলা প্রার্থী ছাড়া বাকিরা রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলেন। কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তার পনেরো বছর পর আবার একবার এইরকম 'ইন্টারভিউ' তাঁকে নিতে হয়েছিল। এইবারও তিনি ইচ্ছে করেই সেই পুরাতন প্রশ্নটি পরীক্ষার্থীদের করেছিলেন। এবং তিনি আশ্চর্য হলেন। সকলেই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, নিশ্চয়, ঠিকই তো হয়েছে। ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রকে অটলজী লোককল্যাণকারী শক্তিরূপে দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত করে জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁকে 'রাষ্ট্রনায়ক'-এর মর্যাদায় উত্তরণ করেছিল। যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগরণ তাঁর জীবনদর্শন, পোখরান সেই পথের একটা মাইল ফলক।

'রাষ্ট্র' সম্পর্কে অটলজীর ধারণা ছিল খুব স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন— আমাদের রাষ্ট্র অতি প্রাচীন। ১৯৪৭ সালে এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা ভারতে আসার আগেও আমাদের রাষ্ট্র ছিল। অথর্ব বেদেও আমাদের রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। 'মাতা ভূমি হি পুত্রোহম্ পৃথিব্যা।' এই পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তাঁর পুত্র। অটলজী লিখছেন—

'ভারত জমীন কা টুকরা নহীঁ,
জীতা জাগতা রাষ্ট্রপুরুষ হ্যায়
...ইসকা কংকর-কংকর শঙ্কর হ্যায়।
ইসকা বিন্দু বিন্দু গঙ্গাজল হ্যায়।
হম জিয়েঙ্গে তো ইসকে লিয়ে,
মরেঙ্গে তো ইসকে লিয়ে।'

এই আবেগাত্মক সম্পর্কই রাষ্ট্রীয়তা বা জাতিয়তার মূল ভিত্তি। আর মাতা-পুত্রের থেকে আর কী বড় সম্পর্ক থাকতে পারে? ছোট বড় বহু নদী গঙ্গার জলে মিশে গেলেও গঙ্গা যেমন গঙ্গাই থাকে, তেমনই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে 'মোগল-পাঠান-শক্-হূণদল এক দেহে হলো লীন।' আমাদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্মাতা ও পালক এবং তারা হিন্দু হিসেবেই পরিচিত, তাই এই মূলধারার জীবন প্রবাহকে হিন্দুত্ব বললে অত্যুক্তি হয় না। 'হিন্দু তন, হিন্দু মন, হিন্দু জীবন' কিংবা 'রগ-রগ হিন্দু মেরা পরিচয়'-এর লেখক অবশ্য 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি ভারতীয়' বলতেই বেশি পছন্দ করতেন। বস্তুত হিন্দুত্ব হলো সর্বসন্নিবেশক— "All inclusive'। হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব সমার্থক। 'ভারতমাতা কী জয়'— হিন্দুজাতিরই জয়ঘোষ। এক সঙ্গে চলাই তার সংকল্প— 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্'... বিশ্বকে আপন করে নেওয়াই তার মর্মবাণী— বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই সত্যকেই তিনি আজীবন ধরে রেখেছিলেন। এরই প্রতিধ্বনি দেখি যখন অটলজী বলেন— "Today in the House, I Shall speak only the truth and nothing but the truth' (Lok Sabha, 17.12.1992)।

অটলজী যখন এই কথা বলছেন, সারাদেশ জুড়ে তখন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। বাবরি কাঠামো ধ্বংস হয়েছে। আদবানীজী কারারুদ্ধ। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আর এস এস ও ভি এইচ পি নিষিদ্ধ। বিজেপি কাঠগড়ায়। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও অটলজী আপোশ করেননি। সত্যকে আঁকড়ে ছিলেন।

সত্যকে আঁকড়ে থাকার এই প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আসলে জীবনকে এক আদর্শবোধের দৃষ্টিতে দেখার নামই হলো সত্য। আর এস এসের সংকল্প বা প্রতিজ্ঞায় এই সত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অটলজী সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক। কিছুদিন প্রচারক জীবনও যাপন করেছেন। পরে শ্রীগুরুজীর কথামতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সহযোগী হয়েছিলেন। রাষ্ট্রকে 'পরমবৈভব' সম্পন্ন করাই সঙ্ঘের লক্ষ্য। অটলজী সারাজীবন ধরে তাঁর ভাবনা-চিন্তায় লেখায় ভাষণে এই লক্ষ্য পূরণেই কাজ করে গেছেন। অটলজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাই যথার্থই বলেছেন— ''নীতির জন্য তাঁর দায়বদ্ধতার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁকে চিরকাল মনে রাখব একজন বড় মাপের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে''। ■

# কবিতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়

**যুগলকিশোর জৈথলিয়া**

অটলবিহারী বাজপেয়ীকে দেখেছি অনেক দিন ধরেই। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আলাপের সূত্রপাত ১৯৮২ সাল থেকে। সেই সময় আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্বে রয়েছি। ছোটো থেকেই আমি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ছেলেবেলায় রাজস্থানে থাকার সময়ই সঙ্ঘের শাখায় যাতায়াত শুরু। পরে ১৯৫৩ সালে যখন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে আসি,

অটলজীর কবিতাপাঠের আসরে লেখক।

তারপর কলেজে আইন পড়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কম করেছি, তার মধ্যে সঙ্ঘের দায়িত্বও পালন করেছি। যাই হোক, ১৯৮২ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন।

সঙ্ঘের অনুমতি পেয়ে জোড়াবাগানে নির্বাচনে দাঁড়ালাম। কিন্তু কিছু সমস্যা ঘাড়ে চাপল। প্রথমত, আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী হলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অনেকে ভয় দেখাল যে, তোমার তো একে রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা নেই, তার ওপরে তোমার বিরোধী প্রার্থীও ভালো প্রকৃতির লোক নয়। যদিও ভয় পাওয়ার লোক আমি ছিলাম না। কিন্তু দলের মধ্যেও কিছু সমস্যা তৈরি হলো। এই কেন্দ্রে দলে টিকিটের দাবিদার ছিলেন আরও দু'জন। তার মধ্যে একজন আবার দলের উত্তরপূর্ব কলকাতা জেলার সভাপতিও বটে। আমার নির্বাচনী প্রচারে অটলজী, আদবানিজী এবং ভাণ্ডারিজী এসেছিলেন। তো ওই দু'জন গিয়ে অটলজীকে বললেন যে আমি দলের সদস্যও নই, পদাধিকারী তো নয়ই। সুতরাং আমি কোন যুক্তিতে বিধানসভায় লড়ার টিকিট পাই? অটলজী আমাকে ডেকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, ওঁরা যা বলছেন তা ঠিকই। কিন্তু ভাণ্ডারিজী আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। সুন্দরসিংহ ভাণ্ডারির মান্যতা তখন দলে প্রশ্নাতীত। 'মাস্টারজী' হিসেবে তিনি সবার মান্যতা পেয়েছেন। অটলজী তাঁদের বোঝালেন, ভাণ্ডারিজী তো অবিবেচক নন। তিনি যোগ্য ব্যক্তির হতেই এই বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব সঁপেছেন।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে সেই আমার ঘনিষ্ঠতার শুরু। এরপর তিনি যখনই কলকাতায় এসেছেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তখন আমিও সঙ্ঘের দায়িত্ব ছেড়ে বিজেপি-র কাজে মনোনিবেশ করেছি।

আমি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সত্যিকারের গুণমুগ্ধ ছিলাম। তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ছিলেন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। পরে রাজ্যসভায় যান। সাহিত্য- ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যেও। ফলে আমাদের মধ্যে একটা সাহিত্য আড্ডা গড়ে উঠেছিল। বিজেপি পার্টিটা করার ক্ষেত্রে আমার একটা মুখ্য আকর্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহিত্যচর্চা। কলেজ জীবন থেকেই আমার কবিতা লেখার ঝোঁক। আমি বহু কবিতা লিখেছি। কবিতা-প্রবন্ধ মিলিয়ে আমার গোটা দশ-বারো বইও বেরিয়েছে। ১৯৯৪ সালে কুমারসভা পুস্তকালয় তার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী অটলজীর কবিতা-পাঠের আসরের আয়োজন করেছিল। তখন আমিই ছিলাম কুমারসভার সভাপতি। পরে তাঁর কবিতার বই ও ক্যাসেটও বেরিয়েছিল। সেই বই ও ক্যাসেট তাঁর নয়াদিল্লির বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

তিনি তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। একবার তেরোদিনের জন্য, একবার তেরো মাসের জন্য, আর শেষবার সাড়ে চার বছরের জন্য। তিনি দেশের বড়ো সম্পদ। পাকিস্তান সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই মোক্ষম কথাটা বলেছিলেন যে, 'আমরা সব কিছু পরিবর্তন করতে পারি, কিন্তু প্রতিবেশী নয়।' তাই উদারতা দেখিয়ে ভারত-পাক মৈত্রীবাস যাত্রা শুরু করেছিলেন। যদিও পাকিস্তান শোধরায়নি। প্রধানমন্ত্রিত্বকালে আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জাতিসঙ্ঘে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি হিন্দিতে বক্তৃতা করেছিলেন। নদী সংযুক্তির মাধ্যমে তিনি বন্যা ও খরার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্তি দিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থার পর জনতা পার্টির সরকার হলে মোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে তিনি বিদেশমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব নিপুণতার সঙ্গে সামলেছেন। ১৯৮০ সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির অঙ্কুর বিকশিত হচ্ছে তখন বোম্বাই অধিবেশনে এম কে চাগলা সভাপতি অটলজীকে দেখে যথার্থ বলেছিলেন— 'দল এখনও গঠিত হয়নি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর রূপ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি'। ভুলে গেলে চলবে না তিনি বাইশ দলের জোট সরকার চালিয়েছেন প্রায় একার কৃতিত্বে। যার মধ্যে মমতা কিংবা জয়ললিতার মতো জোট শরিকরাও ছিলেন যাঁদের সামলানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। জাতীয় রাজনীতিতে অটলজীর এই অবদান দেশ কখনও বিস্মৃত হবে না। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী। বিরোধী-দলনেতা হিসেবে পণ্ডিত নেহরু তাঁর ভাষণ শুনতে বিশেষ পছন্দ করতেন। তাঁর সাহিত্য-চেতনা তাঁর রাজনৈতিক ভাষণকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছিল। দেশ তাঁকে একজন মহান রাষ্ট্রনেতা, দেশভক্ত রাজনীতিক হিসেবে মনে রাখবে।

*(অনুলিখন : সারথি মিত্র)*
*(পুনঃ প্রকাশিত)*

# অজাতশত্রু অটলবিহারী বাজপেয়ী

## আমার আদর্শ, গুরু এবং পথপ্রদর্শক : নরেন্দ্র মোদী

আমার চোখে অটলজী বিরলতম গুণাবলীর একজন মানুষ। তিনি জীবনে যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার আদর্শ, গুরু এবং পথপ্রদর্শক! আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। আজ আমরা এক আত্মপ্রত্যয়ী জাতি। এই পথ অটলজীই আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। একুশ শতকে ভারত যাতে বিশ্বনেতৃত্বের সুযোগ্য অংশীদার হয়ে উঠতে পারে তার ভিত স্থাপন করে গেছেন অটলজী।

## আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু : লালকৃষ্ণ আদবানী

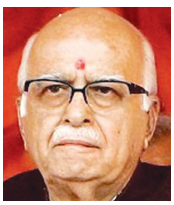

আমি মর্মাহত। কথা বলার মতো ভাষা বা শক্তি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পঁয়ষট্টি বছর আমি আর অটলজী অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বহুক্ষেত্রে অটলজী আমাকে সাহস দিয়েছেন, রাস্তা দেখিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, বিস্ময়কর বাগ্মিতা, অনমনীয় দেশপ্রেম এবং অন্যান্য মানবিক গুণ, যেমন সহমর্মিতা ও সহানুভূতি আমাকে প্রভাবিত করেছে বারবার। ওকে আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না।

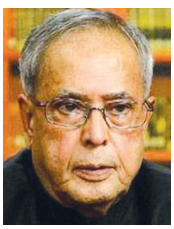

## ঐক্যের পূজারি : প্রণব মুখোপাধ্যায়

অটলজী অসাধারণ সাংসদ ছিলেন এবং দক্ষ প্রশাসক। ১৯৯১ সালে ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়েছিল, অটলজী তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সবাইকে নিয়ে চলতে পারা ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ। যে কারণে কোয়ালিশন সরকার চালানোর হাজারো ঝক্কি সামলে তিনি জম্মু-কাশ্মীরে সদর্থক পদক্ষেপ করেছিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও তাঁর অন্যতম প্রধান সাফল্য। অটলজী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পূর্বসূরিদের বিশেষ করে নেহরুজীর পদাঙ্ক যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

## বড়ো মনের মানুষ : সোনিয়া গান্ধী

আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রীবাজপেয়ী ছিলেন মহীরূহ-সম ব্যক্তিত্ব। তিনি সাধারণ সাংসদ হোন বা ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী, সারা জীবন শ্রীবাজপেয়ী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস রেখেছেন এবং রাজনীতিতে তা প্রয়োগ করেছেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। অটলজী এমন একজন রাজনীতিক যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। দেশ তাঁর কাছে প্রথম ও শেষ কথা। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনওকিছুই তার মনে স্থান পেত না। অটলজী ছিলেন খুব বড়ো মনের মানুষ।

## ওঁকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

খবরটা শোনা অবধি মনটা খারাপ। অটলজীকে নিয়ে আমার অনেক সুখস্মৃতি আছে। আমাদের সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। ওঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম। যে কারণে সব কর্মসূচি বাতিল করে দিল্লিতে ছুটে এসেছি।

## দেশ এক সুসন্তানকে হারাল : রাহুল গান্ধী

অটলজীকে কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক সুসন্তানকে হারাল। তাঁর পরিবার এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা সকলেই তাঁর অভাব অনুভব করব।

## অসাধারণ নেতা অসামান্য মানুষ : সীতারাম ইয়েচুরি

তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা একে অপরের বিরোধী ছিলাম। কিন্তু অটলজী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সৌজন্যবোধ এবং ইতিবাচক মানসিকতার কারণে বিরোধীদের কাছে টেনে নিতে পারতেন। রাজনৈতিক জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত থাকলেও তার জন্য ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য কোনওদিন নষ্ট হয়নি।

## পাক-ভারত শান্তিদৌত্য তাঁর সেরা কাজ : ফারুক আবদুল্লা

অটলজী ছিলেন মহৎ মানুষ। ওঁর সেই সনাতন মূল্যবোধ আমি আর কারোর মধ্যে দেখিনি। অটলজী ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। পরে জনসঙ্ঘে যোগ দেন। তিনি চাইতেন ভারত সবার দেশ হোক। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত দৃঢ় করার বাসনা ছিল তাঁর। চেষ্টাও করেছিলেন। আমি আশা করব বর্তমান ভারত সরকার এবং পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকার অটলজীর স্বপ্নপূরণে যথাযথ উদ্যোগ নেবে।

## নিজের সময়ে শ্রেষ্ঠ নেতা : গুলাম নবি আজাদ

শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে এখন আমরা যে দূরত্ব দেখি অটলজীর সময় তা ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ নেতা। মানুষ তাঁকে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আজাদ এবং ইন্দিরা গান্ধীর মতো মনে রাখবে।

# অটল উবাচ

● ধরুন, কোনও অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো। সেখানে আপনাকে সম্মান জানিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু আপনি যখন আমায় সম্মানিত করেন তখন সেটা আমার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ...আমি তো জানি, আমার অজস্র সীমাবদ্ধতা আছে। বিচারকেরা নিশ্চয়ই সেগুলো গুরুত্ব দেননি। এবং সেখানেই ভুলটা করেছেন। এ এক অদ্ভুত দেশ! এখানে একটা সাধারণ পাথরকেও সিঁদুর পরিয়ে দেবতা বানিয়ে দেওয়া যায়।

**সেরা সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর, ১৭ আগস্ট ১৯৮৪**

● রাজনীতি ক্রমশ ক্ষমতা দখলের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ক্ষমতা হলো অর্থ রোজগারের একটা মাধ্যম। ...দুর্নীতি নিয়ে কেউ আমাদের দিকে আঙুল তোলে না। এটা সত্যিই সৌভাগ্য, আমাদের জীবনে দুর্নীতি এখনও ঢুকে পড়েনি।

**এনডিএ সরকার প্রসঙ্গে, ২৯ মার্চ ২০০৩**

● ম্যাঁয় স্বপ্নোঁ কা সওদাগর নহি হুঁ। মেরে পাঁও জমিন পর ঠিক তরহ্ সে জমে হুয়ে হ্যায়। (আমি স্বপ্ন বিক্রি করি না। আমার পা মাটিতেই আছে)।

**শ্রীনগরে, ২০ এপ্রিল ২০০৩**

● হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়ত্ব আমার কাছে এক। কিন্তু আমি হিন্দুত্বকে ভারতীয়ত্ব বলতেই পছন্দ করি।

**হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে**

● নেহরুজীকে আমি পছন্দ করি। নেহরুজীর মননে আধ্যাত্মিকতার একটা মিশেল

ছিল। ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে উনি যে ভাষায় গঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন সেটা একজন কবির পক্ষেই সম্ভব।

**জওহরলাল নেহরু প্রসঙ্গে**

● আমি কারোর সঙ্গে কখনও চালাকি করি না। কখনও কাউকে অসম্মান করি না। ওস্তাদি করাও আমার পছন্দ নয়। সব দলই জানে আমি তাদের পাশে থাকব। এত বড়ো দেশে কোয়ালিশন সরকার চালাতে গেলে এটা জরুরি।

**কোয়ালিশন ধর্ম প্রসঙ্গে**

● পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিজেপি সবসময়েই প্রস্তুত। একটা সময় ছিল যখন পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করত, এখন আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি। এটা একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

**বিজেপি প্রসঙ্গে**

● ১৯৭৭ সালে বিদেশমন্ত্রী হবার অনেক আগে থেকে আমি একটা স্বপ্নকে মনে মনে লালন করি। সেটা হলো, ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ...ভারতীয় হোন বা পাকিস্তানি, আমি মানুষের মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় যুদ্ধ কোনও সমাধানও নয়, রাস্তাও নয়।

# উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অবদান

**সর্বশিক্ষা অভিযান :**

সর্বশিক্ষা অভিযান আগে চালু হলেও উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। বাজপেয়ী সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে ২১এ অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে। এর ফলে ৬-১৪ বছর বয়েসের বাচ্চাদের পড়াশোনা এই প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তই ছিল ইউপিএ সরকারের শিক্ষার অধিকার আইনের ভিত্তি।

**ভারত এবং ইন্ডিয়া :**

ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে শহরগুলিকে জোড়ার ভাবনা বাজপেয়ী সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই প্রকল্পের পোশাকি নাম স্বর্ণচতুর্ভুজ প্রকল্প। বাজপেয়ী সরকারের আমলে মোট ৫,৮৪৬ কিলোমিটার চার/ছয় লেনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই সব রাস্তা ১৩টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে এসে দেশের প্রধান চারটি মেট্রোশহরে পৌঁছেছে। এই সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম গ্রাম সড়ক যোজনা। এই যোজনায় এখনও পর্যন্ত ৫.৬ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে।

**নতুন ভারত :**

আজ টেলিকম শিল্পে যে জোয়ার দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনিই প্রথম টেলিকম শিল্পে বাঁধাধরা লাইসেন্স ফি তুলে দেন। যার ফলে এগিয়ে আসে অনেক বিদেশি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। এবং টেলিকম শিল্পে বিপ্লবের সূচনা হয়। ■

# ‘সঙ্ঘের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বাজপেয়ী’

*সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম জনপ্রিয়তম তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী লোকান্তরিত হলেন। এই সুত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী নবতীপর সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছু শোনার জন্য পত্রিকার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। হাওড়ার সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের চার ভাইই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সুকুমারবাবু সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। পরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সদস্য ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি হয়েছিলেন। বিজেপির সর্বভারতীয় কর্মসমিতিরও তিনি সদস্য ছিলেন। আজ ৯২ বছর বয়সে তিনি যেমনটা বলেছেন সেটিই উদ্ধৃত হলো।*

**□ বাজপেয়ীর সংস্পর্শে কখন প্রথম আসেন?**

**উত্তর :** হ্যাঁ, আগে বাংলা, বিহার, ওড়িশা নিয়ে বাংলাতেই হতো সঙ্ঘের কার্যক্রম। ১৯৪৬ সালে দাদার (সজল ব্যানার্জি ৯৪, জীবিত) সঙ্গে গিয়ে প্রথম দেখা। বাজপেয়ী মুগ্ধ হয়ে দাদাকে বলেছিলেন আরে আপনি দেখছি বাড়ির লোককেও সঙ্ঘের অধিকারী করে নিয়ে এসেছেন। অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আচ্ছা সকলে মিলে যদি সংসারের কাজ ভালো করে চালাতে পারে, তারা এক লক্ষ্যে এক প্রাণে সঙ্ঘের কাজ কেন করতে পারবে না? সকলকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিতে হবে।

**□ আপনি দিল্লিতে বহুবার কার্যক্রম উপলক্ষ্যে গেছেন, সেখানকার স্মৃতি?**

**উত্তর :** হ্যাঁ, একান্ত ঘরোয়া কথা বলছি। একবার দিল্লিতে নির্দিষ্ট কর্মস্থলের বাড়ির নীচে আমি, রামপ্রসাদ দাস গল্প করছি। বাজপেয়ী সকলকে ভেতরে ডাকলেন। আমি তাঁকে বললাম, দেখুন অনেকে সভাতে মনের সব কথা খুলে বলতে পারে না, লজ্জা পায়। তিনি বললেন, কোনো কিছু চেপে রাখবে না। মনের ভাবনাটা উদ্ভাসিত করবে। সেটা অন্য মানুষের মনে ছবি হয়ে থাকবে। অভিজ্ঞতাটা লিখবে। আজ তুমি দেশের জন্য কী কাজ করেছ মনে পড়ছে? সেটা এমনভাবে কর যাতে তা মানুষের পাথেয় হয়ে ওঠে— ‘‘কুছ পরোয়া নেহি, কই ডরকা কাম নেহি, তুম আপনা মন কা কাম করতে যাও, করতে যাও, ইসসেই তুমহারা উপর ভগবানকা সাথ মিলেগা। আভি ছুট্টি। খানেকা সময় হো গিয়া যাও সব।’’ খাওয়া-দাওয়ার পর আবার ডেকে নিলেন। নিজে শুরু করলেন গান। নাগপুরে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ভিত্তিক একটি গান ‘নাগপুরসে যো লাগি আগ, ভারতমাতা কি সুহাগ। প্রতিপদ জ্বলতে হি যাতা হ্যায়, দেখো হম প্রতিপদ বাড়তে হি জাতা হ্যায়, য্যায়সা কি মা চণ্ডকি মুণ্ডমালা।’

সঙ্ঘের এক অনুষ্ঠানে প্রার্থনারত অটলজী।

**□ আচ্ছা, তিনি তো জনসঙ্ঘের শুরুর সময় থেকেই ছিলেন?**

**উত্তর :** সম্ভবত ১৯৫০-এর অক্টোবর মাস নাগাদ মনুমেন্টের এক সভায় শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গটি তোলেন। ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটে একটি ঘরোয়া সভায় শ্যামাপ্রসাদ ইন্ডিয়ান রিপাবলিক পার্টি নাম দেওয়ার কথা বললে শ্রীগুরুজী ‘ভারতীয় জনসঙ্ঘ’-এর নাম প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন এই রাজনৈতিক দল চালাতে তিনি শ্যামাপ্রসাদকে সেরা কিছু স্বয়ংসেবক দেবেন। নিয়োজিত হন অটলবিহারী, দিল্লির বসন্তরাও ওক, দীনদয়াল উপাধ্যায়, মুরলীচাঁদ শর্মা প্রমুখ। বাজপেয়ী ততদিনে কচ্ছ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে ফেলেছেন।

**□ কলকাতায় এলে কোথায় থাকতেন, খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা?**

**উত্তর :** বললাম না, তিনি আজীবন প্রচারক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। এখানে এলে বহু সময়ই ঘনশ্যামদাস বেরিওয়ালের বাড়িতে থাকতেন। অনেকে মনে করেন তিনি হয়তো নিরামিষাশী ছিলেন, তা নয়। তিনি চিংড়ি মাছ খুব ভালবাসতেন। একবার হাওড়ার এক গ্রামাঞ্চলে তাঁকে টাটকা চিংড়ি মাছ রান্না করে খাইয়েছিলাম। কলা ছিল তাঁর প্রিয় ফল। সবই জানতাম, কেননা তিনি বন্ধুর মতো মিশতেন।

**□ একটা কথা প্রায়ই বলা হতো তিনি নরমপন্থী, আদবানীই সঙ্ঘের প্রধান মুখ।**

**উত্তর :** একেবারেই ভুল। বহু রাত একসঙ্গে কাটিয়েছি। একই স্থানে শুয়েছি। এমন সব ভাবনা মনে ঠাঁই পেলে তাঁর প্রকাশ ঘটতই। ১৯৪৬ থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে ১৯৯৬ সময়টাতো কম নয়। জোর গলায় বলতে পারি কোনো বিরোধিতা ছিল না। সঙ্ঘের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা খাদহীন, তিনি বলেওছেন বহুবার। এসবই কিছু ইংরেজি জানা ‘ট্যাশ’ সাংবাদিকদের প্রচার। অবশ্যই দলের মধ্যে আদবানীর একরকম মত, মোদীর একরকম মত, বাজপেয়ীর একরকম থাকতেই পারে। সেসব রিপোর্টে পেশ হতো। কিন্তু দেশহিতের ক্ষেত্রে সকলেই ছিলেন একমত। এ খবরগুলো নিয়ে ‘ট্যাশ’ সাংবাদিকরা বিভেদ তৈরি করত, লেলিয়ে দিত। বাজপেয়ী অত্যন্ত মিশুকে, হাস্যপ্রিয় উদারমনা মানুষ ছিলেন। তিনি দেশ ছাড়া কিছু ভাবেননি। তিনি ছিলেন ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’-এর জীবন্ত প্রতিনিধি। তিনি নেই— ভাবতেই পারছি না।

*অনুলিখন : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।*

# অটলবিহারী বাজপেয়ী

**(২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪—১৬ আগস্ট, ২০১৮)**

**১৯২৪ :** জন্ম গোয়ালিয়রে। বাবা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন পেশায় শিক্ষক। মা কৃষ্ণা দেবী। পড়াশোনা গোয়ালিয়রের ভিকটোরিয়া কলেজে। অধুনা যার নাম লক্ষ্মীবাই কলেজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেন কানপুরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ থেকে।

**১৯৩০ :** তাঁর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান তিরিশের দশকে।

**১৯৪২ :** ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ২৪ দিনের কারাবাস।

**১৯৫১ :** ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগদান।

**১৯৫৭ :** উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে প্রথম সাংসদ নির্বাচিত হন। সেবার তিনি বলরামপুর ছাড়া লখনৌ এবং মথুরা থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। লখনৌয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। মথুরায় তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

**১৯৬২ :** রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন।

**১৯৭৫ :** জরুরি অবস্থার সময় কারাবাস।

**১৯৭৭ :** ভারতীয় জনসঙ্ঘ জনতা পার্টিতে মিশে যায়। জনতা সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন।

**১৯৮০ :** ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসেবে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন।

**১৯৮৪ :** লোকসভা নির্বাচনে গোয়ালিয়র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২ লক্ষ ভোটে পরাজিত হন।

**১৯৯১ :** দশম লোকসভা নির্বাচনে লখনৌ থেকে পুনর্নির্বাচিত হন।

**১৯৯২ :** পদ্মবিভূষণ সম্মান লাভ করেন।

**১৯৯৬ :** বিরোধী রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে চার দশক কাটানোর পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে সেই সরকারের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১৩ দিন।

**১৯৯৮, মার্চ :** প্রথম এন ডি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার নেন।

**১৯৯৮, মে :** পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষা।

**১৯৯৯, ফেব্রুয়ারি :** ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে লাহোর যাত্রা। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক বাস সার্ভিসের সূচনা।

**১৯৯৯, ১৭ এপ্রিল :** আস্থা ভোটে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে হেরে যাওয়ার কারণে পদত্যাগ। নতুন সরকার দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত তিনি কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

**১৯৯৯, মে-জুন :** লাহোর যাত্রার মাত্র তিন মাস পর কার্গিল সীমান্তে পাক-আগ্রাসন রোধ করতে তিনি সেনা-অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। এই অভিযানের পোশাকি নাম ছিল 'অপারেশন বিজয়'।

**২০০০, অক্টোবর :** হাঁটুর অপারেশনের জন্য বিদেশযাত্রা।

**২০০১ :** আগ্রা সামিটের উদ্যোগ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পরভেজ মুশারফের অংশগ্রহণ।

**২০০৪, ১৩ মে :** লোকসভা নির্বাচনে লখনৌ থেকে জয়লাভ। এটি ছিল তার দশম জয়লাভ। লখনৌ থেকে পঞ্চমবার।

**২০০৫, ২৯ ডিসেম্বর :** রাজনীতি থেকে অবসর।

**২০১৪, ২৫ ডিসেম্বর :** বাজপেয়ীর জন্মদিনটি 'সুশাসন দিবস' হিসেবে ঘোষণা।

**২০১৫ :** ভারতরত্ন সম্মানপ্রাপ্তি। ■

# ভারতীয়করণ এখন আর কোনও স্লোগান নয় : অটলবিহারী বাজপেয়ী

জাতীয়করণ এখন ভারতের প্রধান সমস্যা নয়। এ ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে। ইংলন্ডে লেবার পার্টি জাতীয়করণের পক্ষে, আবার কনজারভেটিভ পার্টি তার বিরোধী। কিন্তু দু'পক্ষই শক্তিশালী গণতন্ত্রের পক্ষে। আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য এমন কিছু করা উচিত নয় যা সরাসরি গণতন্ত্রের মূলে গিয়ে আঘাত করে। প্রধানমন্ত্রী (ইন্দিরা গান্ধী) বলছেন, তাঁর লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা। গণতান্ত্রিক সমাজবাদে যদি সমাজবাদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় গণতন্ত্র উপেক্ষিত হয় তা হলে সেই সমাজবাদেরও কোনও মূল্য থাকে না। ...সুতরাং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ভাবনা এমনভাবে ভাবতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক অনুভব কোনওভাবে আহত না হয়।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের ভারতীয়করণ কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রী (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) পার্টির প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। যেখানেই যাচ্ছেন আমাদের তুলোধুনা করছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই, বিনামূল্যে আমাদের প্রচারও করছেন। আমরা তাঁর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। কিন্তু ভারতীয়করণের ধারণাটি তিনি ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। কিংবা জেনেবুঝেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

ভারতীয়করণ শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটা ঠিক নয়। দেশের ৫২ কোটি (ষাটের দশকের শেষে ভারতের জনসংখ্যা) মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারতীয়করণ কোনও স্লোগান নয়। জাতির পুনর্জাগরণের জন্য ভারতীয়করণ একটি মন্ত্র। ভারতীয়করণের এক এবং একমাত্র অর্থ হলো— ভাষা, ধর্ম, প্রদেশ, যাই হোক, প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের দেশের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। দেশ সবার আগে, বাকি যা আছে সব তার পর। এর মধ্যে আপত্তির কিছু কি আছে?

বাহান্ন কোটি মানুষের এই দেশে ব্রাহ্মণ হরিজন শিখ জৈন— প্রত্যেকের ভিন্ন ব্যক্তিপরিচয় আছে। মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও তাই। এছাড়াও রয়েছে প্রাদেশিক এবং ভাষাগত পরিচয়। কিন্তু এদের মধ্যে কতজন দেশের (অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তার) প্রতি দায়বদ্ধ তা হাতে গুনে বলে দেওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই প্রশ্ন তোলেন, ভারতীয়দের আবার ভারতীয়করণ কী? আমার প্রশ্ন, একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের জাতীয়করণেরই বা কী প্রয়োজন? আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। ...কিন্তু সেটা শুধু মানুষের আকৃতি-প্রকৃতির জন্য নয়। হৃদয়, মেধা, সংস্কার এবং জ্ঞানের জন্য। ঠিক তেমনিভাবে আমরা প্রত্যেকেই ভারতীয়। কারণ আমরা ভারতে জন্মেছি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে ভারতের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। ...পশ্চিমবঙ্গে মাওয়ের মানসপুত্রেরা তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। রেডবুক হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। অশ্রদ্ধা করছে গীতাকে। গীতাঞ্জলিকে। এদের কি ভারতীয় করে তোলা উচিত নয়?

বেলাগাম মুসলমান তোষণ করে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনাকে সর্বত্রগামী করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা কংগ্রেসের ভাবনা নয়। এটা একটা মন্ত্র যা এ দেশের সংস্কৃতিরই অঙ্গ। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা কি ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলাম? পাকিস্তান করেছিল, আমরা করিনি। কেন? কারণ আমাদের সংস্কৃতি এটা অনুমোদন করে না। হিন্দুধর্মে উপাসনার অজস্র পদ্ধতি আছে। আমরা কখনও বলি না— কেবলমাত্র একটি গ্রন্থকে মেনে চলো কিংবা একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করো। না হলে তোমায় নরকে যেতে হবে। সত্য একটাই, কিন্তু সত্য উপলব্ধির অনেক পথ আছে। ঈশ্বর একজনই, কিন্তু তাঁকে জানার অনেক পথ আছে। কিন্তু আজকাল ধর্মনিরপেক্ষতার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দু-বিরোধিতা।

গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার মতো এই সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতাও সন্দেহজনক। এই সন্দেহ দূর করা দরকার। আমার হিন্দুত্ব নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু তার মানে এই নয় আমি ইসলাম বিরোধী। কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যমদূতেরা প্রশ্রয় পায় যখন রাজনীতির সঙ্গে উপাসনা-নির্ভর ধর্মবিশ্বাসকে মিশিয়ে ফেলা হয়। যখন সাম্প্রদায়িক ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া চলে এবং যখন বিচ্ছিন্নতাবাদকে রাজনৈতিক স্বার্থে ইন্ধন জোগানো হয়।

*(১৯৭০ সালে লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষেপিত অনুবাদ)*

# শান্তিনিকেতনে আচার্য বাজপেয়ীর স্মৃতি

**তিলক সেনগুপ্ত**

বাগ্মী কবি রাজনেতা আচার্যকে হারিয়ে স্মৃতিমেদুর শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীর দশম আচার্য রূপে দায়িত্ব নেন দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী।

কিন্তু আচার্যরূপে দায়িত্ব নেবার অনেক আগে থেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আর্কষণ। এমনকী বিশ্বভারতীর প্রতিও ছিল তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ।

সময়টা সত্তরের দশক হবে। সেই সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ। তৎকালীন ভারত সরকার বিশ্বভারতী নিয়ে সংসদে বিল আনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের সংসদীয় কমিটি গড়ল। সেই সংসদীয় কমিটির অন্যতম সদস্য তৎকালীন সাংসদ অটলবিহারী বাজপেয়ী। তাঁর নেতৃত্বে ওই উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সংসদ সদস্যরা এলেন শান্তিনিকেতনে। বাজপেয়ী শুধু সেদিন বিশ্বভারতীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেননি, ঘুরেছেন খতিয়ে দেখেছেন এখানকার ক্যাম্পাসের ভৌগোলিক অবস্থা। বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থার খবর নেন। রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কী করে সম্ভব আলোচনা করেন তৎকালীন প্রবীণ আশ্রমিকদের সঙ্গে।

সেদিনের কথা বলছিলেন আশ্রমিক স্বপন কুমার ঘোষ। তাঁর কথায়, শান্তিনিকেতনে বাজপেয়ীর বন্ধু ছিলেন তৎকালীন হিন্দি ভবনের অধ্যক্ষ রাম সিংহ তোমর। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে এতটাই আকর্ষণ করত যে কবির 'ভারত তীর্থ' কবিতা হিন্দি অনুবাদ চেয়েছিলেন বন্ধুর কাছে।

বন্ধুকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন গুরুদেবের 'ভারততীর্থ' কবিতার হিন্দি অনুবাদ করে দিতে। সেইমতো বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান রামবহাল তিওয়ারির সহযোগিতায় ওই কবিতা হিন্দিতে অনুবাদ করে বাজপেয়ীকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কাছে প্রায়ই বিশ্বভারতী নিয়ে খবর নিতেন বাজপেয়ী। তবে সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে এলেন, তখন শ্রীনিকেতনে মেলা চলছিল। বিশ্বভারতীর সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেন। এরপরই শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে মেলায় যাবার সময় আমাকে বললেন, 'সাংবাদিক বন্ধু। চলুন মেলা দেখে আসি।' আমরা তাঁর গাড়িতে উঠলাম। মেলা দেখে ফেরা হলো। পথে খবর নিলেন কী করলে আশ্রমের আরও উন্নতি হবে। তিনি বিশ্বভারতী নিয়ে খুবই ভাবতেন।

সেই প্রবীণ সাংসদ ২০০১ সালে এলেন বিশ্বভারতীর আচার্য রূপে। উপলক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বভারতী সমাবর্তন। ১৫ ডিসেম্বর কনভোকেশনের দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সংসদ ভবনে হামলার ঘটনা ঘটে গেল। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের ব্যবস্থা প্রায় সেরে ফেলেছেন। এত করেও কর্তৃপক্ষ বার বার চিন্তা করছেন। ওই বোধ হয় প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যাবে।

তৎকালীন উপাচার্য সুজিত বসু বলেন, ''স্বয়ং আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মুরলীমনোহর যোশীর চেষ্টায় আমার বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়ে আসা। আমি জুন মাসে যোগদান করলাম বিশ্বভারতীতে। এসে দেখি দু'তিন বছর সমাবর্তন হয়নি। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর সার্টিফিকেট আটকে আছে। আচার্যকে জানালাম। তিনি সম্মতি জানালেন। দিন ঠিক হলো। কিন্তু সংসদ হামলায় সব টলমল হয়ে গেল। কিন্তু সেই সময় বাজপেয়ীর আগ্রহের কারণে তা সম্ভব হয়েছিল।''

''তখন একদিকে সংসদে হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা চরম ভাবে বাড়ানো হয়েছে। যা নিয়ে নিরাপত্তা এজেন্সি বাজপেয়ীর আসা নিয়ে খুব দরকষাকষি করছে। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানালো বিশ্বভারতী কনভোকেশনে যে শোভাযাত্রা হয় তাতে হাঁটতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী। কারণ হাঁটুর যন্ত্রণায় কাতর প্রধানমন্ত্রী। ডাক্তারের নিষেধ। আকাশ ভেঙে পড়ল

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মাথায়। কারণ একদিকে বিশ্বভারতী ঐতিহ্য, অন্যদিকে আচার্য অসুস্থতা নিয়ে আসছেন।

এই অবস্থায় মুস্কিল আসান বাজপেয়ী নিজে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ২৬ পা হাঁটতে পারবেন শুনেই আচার্য অটলবিহারী বাজপেয়ী শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জের মাঝখানে আলপনা দেওয়া রাস্তা দিয়ে হাটলেন। ঐতিহ্য মেনে হেঁটে উঠলেন জহর বেদীতে।

সেদিনের সেই কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিমেদুর প্রাক্তন উপাচার্য সুজিত বসু বলেন, ''আমাদের জানানো হলো তিনি ২৬ পা মতো হাঁটবেন। সেই মতো সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, আধিকারিকরা শোভাযাত্রা করে এলেন আম্রকুঞ্জে। আচার্য যোগ দিলেন শোভাযাত্রায়। তাঁর বিশ্বভারতী নিয়ে খুব উৎসাহ ছিল।''

তবে শুধু সমাবর্তনের শোভাযাত্রায় হাঁটা নয়। পায়ের সমস্যার কারণে তিনি সমাবর্তন মঞ্চে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। তাই আচার্য হাত দিয়ে সকল সফল ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে সার্টিফিকেট এবং সপ্তপর্ণী দিতে পারবেন না। ঠিক হলো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি হিসাবে উপাচার্য তা আচার্যের হাত থেকে গ্রহণ করবেন। সেই মতো সব ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ হিন্দি ভবনের ছাত্রী প্রতিভা সিংহ চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন আচার্যকেই সার্টিফিকেট দিতে হবে।

আচার্য বাজপেয়ী পাশে বসা উপাচার্য সুজিত বসুকে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে। উপাচার্য কারণ জানালে মাইক চেয়ে নেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তথা আচার্য। সেদিনের কথা জানালেন প্রাক্তন উপাচার্য সুজিত কুমার বসু, ''আচার্য সার্টিফিকেট দেবেন না কেন এই বলে দল পাকাচ্ছে কিছু ছাত্র-ছাত্রী। বাজপেয়ী জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে? ওরা চিৎকার করছে কেন? আমি বললাম ওরা আপনার হাত থেকে সার্টিফিকেট নেবে। না হলে নেবে না। এই কথা বলা মাত্র আচার্য বাজপেয়ী বললেন আমাকে মাইক দাও। মাইক হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, 'কী করবে বল। তোমাদের আচার্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। বসে বসে তো সপ্তপর্ণী দেওয়া যায় না' শোনা মাত্র মুহূর্তে সবাই শান্ত হয়ে গেলেন। অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব। সমাবর্তন মঞ্চে ফের কিছুটা সময় থেমে গিয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, 'ঠিক কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তোমাদের আচার্যকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করে দেওয়া হয়েছে।' 'অনুষ্ঠানস্থলে সকলেই এই কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন। পড়ুয়াদের ক্ষোভও প্রশমিত হয়েছিল।''

তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে একাধিকবার বিশ্বভারতীর বিভিন্ন প্রসঙ্গ লোকসভায় আলোচিত হয়েছে। সেই সমাবর্তনে উপস্থিত তৎকালীন হিন্দি ভবনের অধ্যাপক চক্রধর ত্রিপাঠী বলেন, ''বাজপেয়ী তাঁর ভাষণে

রবীন্দ্রনাথ গান— গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে-এর কথা উল্লেখ করে কবিগুরুর এই আশ্রম বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কথা বলেন। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী একটু চিৎকার করল তাঁর আপন করা বক্তব্য শুনে সবাই মোহিত হয়ে যায়।''

পরবর্তীকালে ২০০৪ সালে পুনরায় আচার্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ নোবেল চুরি হয়ে গেছে বলে জানা যায়। দেশ তোলপাড় হতে থাকে। আচার্য চুপ করে থাকতে পারেননি। কবির নোবেল চুরির খবর পেয়ে আর এক কবি আচার্য প্রধানমন্ত্রী নিজে ফোন করেন উপাচার্য সুজিত বসুকে। নিজের উদ্যোগে আসার কথা জানালেন। সুজিত বসু বলেন, ''তিনি নিজে আমাকে ফোন করলেন। বললেন আমি নিজে যাব। ২ এপ্রিল এলেন শান্তিনিকেতনে। নোবেল চুরির সিবিআই তদন্তের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বভারতীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য হাইপাওয়ার কমিটির পরামর্শ মতো অর্থ বরাদ্দ করলেন আচার্য। রবীন্দ্র সম্পদ রক্ষার জন্য তৎপরতা দেখালেন। তিনি আচার্য থাকাকালীন অবাধে বিশ্বভারতী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যেত। কোনও আমলা মারফত যেতে হতো না। তিনি বিশ্বভারতীর প্রতি এতটাই আগ্রহী ছিলেন।''

২০০৪ সালে আচার্য হিসাবে বাজপেয়ী শান্তিনিকেতনে আসার পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাখার ব্যবস্থা করেন উদয়ন বাড়িতে। সেখানেই বাজপেয়ীর জন্য বিশেষ ভাবে রান্না হয়েছে। তাতে বাঙালির নানা পদের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ব্যবস্থা হয়েছে। উপাচার্য সুজিত বসু ও আচার্য অটলবিহারী বাজপেয়ী খেতে বসেছেন। খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। মিষ্টিও দেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ আয়োজকদের মনে পড়ছে চিংড়ি দেওয়া হয়নি। এই কথা উপাচার্যকে ইতস্তত ভাবে জানাচ্ছেন তৎকালীন জনসংযোগ আধিকারিক অমিতাভ চৌধুরী। বাজপেয়ী লক্ষ্য করেছেন। কিছু একটা হয়েছে। তিনি পাশে বসে উপাচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে। সুজিতবাবু প্রধানমন্ত্রীকে তা জানাতেই প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন, আরে ঠিক আছে, তোমরা যত্ন করে করেছ, নিয়ে এস।''

তিনি তৃপ্তি করে খেলেন শেষ পাতে চিংড়ি। সম্মান বাঁচল সব পক্ষের। তিনি শেষে মুচকি মুচকি হেসে বললেন বহুত বঢ়িয়া।

সুজিতবাবুর কথায়, এত সহজ সরল মানুষ দেখা যায় না।

# একজন স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী

**বিরাগ পাচপোরে**

সেটা নয়ের দশকের শেষ দিক। রয়টারের এক সাংবাদিক নাগপুরে এসেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ কভার করতে। সেই সাংবাদিকের ইচ্ছে হয়— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখার। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে ওই সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপও হয় আমার। আর এস এস নিয়ে কথা বলতে গিয়েই সাংবাদিক মন্তব্য করেন— 'অটলবিহারী তো আর এস এসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— 'হঠাৎ এরকম মনে হলো কেন আপনার?' ওই সাংবাদিকটি জবাবে আমাকে বলেছিলেন— 'দিল্লিতে এরকমই একটা ধারণা সবার হয়েছে।' নিজের এই ধারণার পক্ষে একটি অদ্ভুত যুক্তি খাড়াও করেছিলেন ওই সাংবাদিক ভদ্রলোক। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ই আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে যোগাযোগ মন্ত্রক। ওই সরকারি অনুষ্ঠানে বাজপেয়ী উপস্থিত থাকলেও লালকৃষ্ণ আদবানী, মুরলীমনোহর যোশী এবং উমা ভারতী— এই তিন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। বলা হয়ে থাকে, এই তিন মন্ত্রী কট্টর আর এস এসপন্থী। এই ঘটনাটি উল্লেখ করেই সাংবাদিক ভদ্রলোক বলেন, এতেই তো বোঝা যায় বাজপেয়ীর সঙ্গে আর এস এসের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যে সময়কার ঘটনা তখন সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জু ভাইয়া)। ওই সাংবাদিক ভদ্রলোক এটাই জানেন না যে, ওই ডাকটিকিট প্রকাশ অনুষ্ঠানে রজ্জু ভাইয়া, অটলজী এবং সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রজ্জু ভাইয়া বা সহ-সরকার্যবাহরা কেউ কি কট্টর আর এস এস পন্থী নন? ওই 'প্রাজ্ঞ সাংবাদিক' কিন্তু এই বিষয়টিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। না এনেই তিনি বলে বসলেন— বাজপেয়ী আর এস এসের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।

আসলে, এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, বাজপেয়ী মধ্যপন্থী, সমঝোতায় আগ্রহী এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তিনি 'কট্টর হিন্দুত্বে' বিশ্বাস করেন না। অতএব তিনি 'একজন ঠিক মানুষ, ভুল দলে' রয়েছেন। কিন্তু এরা কেউ এটাই বুঝতে চাননি যে, কিশোর বয়স থেকেই বাজপেয়ী সঙ্ঘের শিক্ষায় এবং আদর্শে বেড়ে উঠেছেন, সঙ্ঘের ভাবধারায় লালিত হয়েছেন। তিনি নিজেও বলতেন— 'সঙ্ঘ আমার অন্তরে অবস্থান করছে।'

ভাষণরত বালাসাহেব। শ্রোতার আসনে অটলজী।

বাজপেয়ী ছিলেন প্রথম স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৮-২০০৪ এই ছিল তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কাল। তার আগে ১৯৯৬ সালে মাত্র ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন— তখন সরসঙ্ঘচালক ছিলেন বালাসাহেব দেওরস। অটলজী যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, তখন খুব খুশি হয়েছিলেন বালাসাহেব। ১৯৮৪ সালে, যখন বিজেপির খুব দুর্দিন—মাত্র দুজন এমপি— তখনও দলীয় কর্মীদের মনোবল অটুট রাখতে প্রেরণা জুগিয়েছেন অটলজী। দলের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সংগঠনকে আবার মজবুত করে তোলা—খুব সহজ কাজ ছিল না সেই সময়। কিন্তু এই কঠিন কাজটাই বাজপেয়ী করে গিয়েছিলেন। এই কাজটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেননা সঙ্ঘের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বাজপেয়ী। আর সেই শিক্ষাই তাঁকে এই কঠিন কাজ করতে সাহায্য

পূজনীয় শ্রীগুরুজী, দীনদয়ালজী ও অটলজী।

করেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দৃঢ় এবং স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ নির্মাণের কাজ করে থাকে। সঙ্ঘ এমন মানুষই নির্মাণ করে, যারা দেশ এবং সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। অটলজী সঙ্ঘের তৈরি এমনই এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ১৯৩৯ সালে গোয়ালিয়রে সঙ্ঘের শাখায় যোগ দেন অটলজী। পরে নারায়ণরাও তারতের সংস্পর্শে এসে তিনি গোয়ালিয়র থেকে নাগপুর আসেন। নারায়ণ রাও তারতেকেই অটলজী তাঁর পথপ্রদর্শক হিসাবে মানতেন। তিনি লিখেছিলেন— 'আজ আমি যা হয়েছি, তা তারতেজীর জন্যই।' প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই তারতেজীকেই তিনি দিল্লিতে নিজের বাসভবনে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে নাগপুরে সঙ্ঘের কার্যালয়ে গিয়ে তারতেজীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবরও নিয়েছিলেন অটলজী। ২০০৭ সালে নাগপুরে আর এস এসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকরের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন বাজপেয়ী। ওই অনুষ্ঠানে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অটলজী।

তারতেজী ছাড়াও দীনদয়াল উপাধ্যায় অটলজীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বাবাসাহেব আপ্তে, ভাওরাও দেওরস এঁরাও বাজপেয়ীজীকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে সঙ্ঘের শিবিরে যোগদান করে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সান্নিধ্যে আসার সুযোগও হয়েছিল অটলজীর। ১৯৪৪ সালে কলেজের পাঠ শেষ করে সঙ্ঘের প্রচারকের কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন বাজপেয়ীজী।

সঙ্ঘ সম্পর্কে অটলজী লিখেছিলেন— 'সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তন ঘটায় না। সঙ্ঘ সামগ্রিকভাবে সমাজের মনোভাবে বদল আনে। এটিই সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য।' সঙ্ঘ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও বলেছিলেন— 'একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। একবার লখনউতে এক সমাজবাদী কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে যান আচার্য নরেন্দ্র দেব। নরেন্দ্র দেব তাঁকে বলেন— কেমন দল কর তুমি? তোমার দলের লোকেরা কোনো খবর নেয় না। আর এস এস হলে কিন্তু এটা হতো না।'

অটলজীর কাছে সঙ্ঘ ছিল একটা পরিবারের মতো। বলতেন— 'আমরা একটা পরিবার।' অটলজীর প্রয়াণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেছেন— 'আদর্শগত নিষ্ঠাচারের সঙ্গে অটলজীকে সবাই মনে রাখবেন, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেও। একজন দূরদর্শী, তিনি ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারতেন। একজন কবি, সংবেদনশীল মনের মানুষ। সমগ্র জীবন তিনি তাঁর আদর্শে অটলই থেকে গেলেন।'

*(লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক) সৌজন্যে : নিউজ ভারতী*

**'সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তন ঘটায় না। সঙ্ঘ সামগ্রিকভাবে সমাজের মনোভাবে বদল আনে। এটিই সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য।'**

**— শ্রীবাজপেয়ী**

শোকবার্তা লিখছেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।

## এই সময়

### জুনাগড়ে মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জুনাগড়ে একগুচ্ছ

প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি সরকারি হাসপাতাল, একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং জুনাগড় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ। প্রকল্পগুলির জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।

### মধ্যপ্রদেশে বন্যার আশঙ্কা

টানা ৭২ ঘণ্টা ভারী বর্ষণের ফলে মধ্যপ্রদেশে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সরকারি জলাধারের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। রাস্তা জলে ডুবে যাওয়ায় গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। টানা বৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

### আবার কেশুভাই

বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেল সোমনাথ

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে সর্বসম্মতি ক্রমে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। ট্রাস্টের সদস্যরা সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

## সমাবেশ -সমাচার

# পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির উদ্যোগে কলকাতার মানিকতলাস্থিত কার্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয় অখণ্ড ভারত দিবস। ভারতমাতা ও ঋষি অরবিন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের পর অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন বাগুইআটির প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ গবেষক ক্ষিতিপ্রসাদ দত্ত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত ও গজানন বাপট, কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা বিশ্বনাথ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কল্যাণ আশ্রমের কয়েকজন পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের মা-সহ প্রচারক তথা কল্যাণ আশ্রমের সহ-সংগঠন সম্পাদক উত্তম মাহাত'র মাকে মাতৃসংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম বক্তা

ক্ষিতিপ্রসাদ দত্ত ঋষি অরবিন্দের ভারত ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় বক্তা পূর্ণেন্দুবাবু জোর দিয়ে বলেন, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসেনি। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কারণেই স্বাধীনতা এসেছে। অদ্বৈতচরণ দত্ত অখণ্ড ভারতের সনাতন রূপটি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন— দেশভাগ কৃত্রিম, ভারত আবার অখণ্ড হবে। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে দেশত্মবোধক গান পরিবেশন করে হাওড়া সমিতি, কুমারটুলি সমিতি ও মহিষবাথান সমিতির সদস্যরা। শ্রীমতী রঞ্জিতা দাস রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে সকলকে সহভোজে আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সৌমেন মাইতি।

# হাওড়ায় মহামানব চেতনা, মহামানব প্রেরণা প্রদর্শনী

হাওড়া শহরে ধাড়সা চৌধুরীপাড়ায় গত ১৫ আগস্ট মহান মাতৃভূমি কার্যালয়ে মহা সমারোহে 'মহামানব চেতনা -- মহামানব প্রেরণা' শীর্ষক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক তথা ভারত ঐতিহ্য সংস্কৃতি গবেষক অসিত কুমার সিংহ প্রদর্শনীর শুভারম্ভ করেন। উপস্থিত ছিলেন ড. রণিতা রায়চৌধুরী শাস্ত্রী, অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ, ড. নির্মলা শ্রীবাস্তব, ড. হেমলতা ঘোষ, মধুসূদন ভট্টাচার্য, ড. সুমন্ত্রা বিদ্যাভারতী প্রমুখ।

# মালদহে মাতৃভারতীর উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফল বিতরণ

গত ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারত দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মালদহ বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের মাতৃভারতীর উদ্যোগে স্থানীয় মৌলপুর

## এই সময়

**এগিয়ে রাজস্থান**

রাজস্থানকে ডিজিটাল হাব বানানোর পরিকল্পনা অনেকদিনের। সেই পরিকল্পনার

রূপায়ণ ঘটাতে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী দেশের মধ্যে বৃহত্তম স্টার্ট আপ ইনকিউবেশন সেন্টারটি উদ্বোধন করলেন ভামাশায়। এই সেন্টারে ৭০০ টি স্টার্ট আপ প্রকল্পের কাজ হবে।

**৪৭ লাখ**

তার মাথার দাম ৪৭ লক্ষ টাকা। মাওবাদী স্কোয়াডে পাথার সিংহের দাম সম্ভবত আরও

বেশি। ছত্তিশগড়ের পুলিশ তাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। পুলিশের চাপে বেসামাল জঙ্গিনেতা নিজেই ধরা দিয়েছে সম্প্রতি। প্রশাসনের এই চমকপ্রদ সাফল্যে খুশি ছত্তিশগড়ের মানুষ।

**বৌদ্ধ সম্মেলন**

'শান্ত হও, শান্ত থাকো'। বললেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উপলক্ষ্য ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক

বৌদ্ধ সম্মেলন। অনুষ্ঠিত হলো মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে। তথাগত বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম ও শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রপতি জনতার উদ্দেশে শান্তির বার্তা দেন।

## সমাবেশ -সমাচার

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। শিশুমন্দিরে ছেলে-মেয়েদের পৌঁছে দিতে আসা মায়েরা প্রতিদিন অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটান। এই মায়েদের উদ্যোগেই

মাতৃভারতী তৈরি হয়েছে। মাতৃভারতীর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৭ জন চিকিৎসকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বি. এম. ও. এইচ. ডাঃ সৌভিক দাস শিশুমন্দির ও মাতৃভারতীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

## দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের সভা

গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় দিল্লির ঝাণ্ডেওয়ালা মন্দিরে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭১-এর যুদ্ধে শহিদ চুরকা মুর্মুর

প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত ও দিল্লির প্রান্ত সহ প্রচারক প্রমুখ যতীনজী উপস্থিত ছিলেন। ১৫০ জন প্রবাসী বঙ্গভাষী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

## ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠীকে বিশ্ব হিন্দি সম্মানে ভূষিত

হিন্দি সাহিত্যের গৌরব এবং কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠীকে মরিশাসে অনুষ্ঠিত একাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে 'বিশ্ব হিন্দি সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। মরিশাস থেকে তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে কলকাতা মহানগরের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবী তাঁকে অভিনন্দন

## এই সময়

**চাই মুখ**

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউ. আই. ডি. এ. আই) আধার কার্ড

সংক্রান্ত নতুন নিয়ম জারি করেছে। এবার থেকে ব্যক্তি পরিচয়ের ক্ষেত্রে চোখের তারা ও আঙুলের মুখও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে।

**সুষমা সকাশে**

গুরু নানকদেবের আসন্ন ৫৫০ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত

অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের শিখ ধর্মবলম্বী মানুষেরা যাতে যোগ দিতে পারেন তার জন্য বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ।

**নজরে অসম**

অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা পর্যটক মাত্রেরই চোখ জুড়িয়ে দেয়।

সম্প্রতি অসমের পর্যটন শিল্পে জোয়ার আনতে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। এই প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা।

## সমাবেশ -সমাচার

জানান। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাবীর বাজাজ, উপাধ্যক্ষ মোহনলাল পারীক ও শান্তিলাল জৈন, কোষাধ্যক্ষ অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, সাহিত্য সম্পাদক বংশীধর শর্মা। এছাড়া যোগেশরাজ উপাধ্যায়,

নন্দকামার লঢ়া শ্রীরাম সোনী, কবি গিরিধর রায়, শ্রীমোহন তিওয়ারী, জওহরলাল ব্যাস প্রমুখ পস্থিত ছিলেন। সকলেই ড. ত্রিপাঠীকে অভিনন্দন জানান।

### স্বর্গীয় শক্তিশেখর দাস স্মরণে সভা

গত ২১ আগস্ট কলকাতার মানিকতলাস্থিত সংস্কার ভারতীর চর্চাকেন্দ্রে সদ্য প্রয়াত সংস্কার ভারতীর পালক অধিকারী শক্তিশেখর দাস স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী নৃত্যশিল্পী অলকা কানুনগো,

সহ সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়, সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বিকাশ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন -সহ বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা। সকলেই স্বর্গীয় শক্তিশেখর দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

### কালিয়াচকে ভারতমাতা পূজা

গত ১৫ আগস্ট মালদহ জেলার কালিয়াচকের আলিপুরে ভারতমাতা পূজা ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে সাতফুট উচ্চতার ভারতমাতার পূজা সম্পন্ন হয়। সকালে জাতীয় পতাকা ও প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ফরাক্কা ব্যারেজ সি.আই. এস.এফ. কমান্ডান্ট এস. কে. ঝা। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, দেশত্মেবোধক গান, নাচ ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্ণনা-সহ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পূজায় এলাকার মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

# শ্রীকৃষ্ণজন্মের পারিপার্শ্বিক

**ড. সীতানাথ গোস্বামী**

মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র হলেন কংস এবং কন্যা দেবকী। কংস চেয়েছিলেন যে, উগ্রসেনের মন্ত্রী বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ হোক। এই সম্পর্ক উভয়েরই অনুকূল হওয়ায় উভয়েরই অভিপ্রেত ছিল। এই বিবাহ উভয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সঙ্গত হবে বলে উভয়েই মনে করতেন। পরে যখন এই অভিপ্রায় কার্যে রূপান্তরিত হলো তখন বিবাহের পর যখন পতি-পত্নী একত্র একটি অশ্বচালিত যানে যাচ্ছিলেন তখন কংস অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক এবং ভগিনীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য অশ্বের লাগাম নিজেই ধরে চলছিলেন। তখন আকাশবাণী হলো— ''রে রে কংস, তুমি যার বিবাহে অশ্বের লাগাম ধরে চলেছ সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভ তোমার ঘাতক হবে।"

পথিপ্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমোগর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ।।

(ভাগবত ১০।১।৩৪)

এই কথা শোনা মাত্রই ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ কংস সেই বিবাহের অনুষ্ঠান চলাকালেই ভগিনীর চুলের মুঠি একহাতে ধরে অন্যহাতে খড়্গ নিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। সেই সময় বসুদেব নৃশংস কংসকে নিবৃত্ত করার জন্য বললেন—

''শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি।।"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১।৩৭

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, কংসকে ১০-১-৩৫ শ্লোকে কুল পাংসন বা কুলের কলঙ্ক বলা হয়েছে, অথচ সেই কুলকলঙ্ক কংসকেই পরবর্তী ৩৭ শ্লোকে ভোজযশস্কর বা ভোজবংশের যশোবৃদ্ধিকারী বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

প্রথমস্থলে বস্তুস্থিতি নির্দেশিত হয়েছে বা ভোজবংশের কিন্তু দ্বিতীয়স্থলে বসুদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সততার জন্য এবং কার্যসিদ্ধির অনুকূল হবে বলে সেই কংসকেই ভোজবংশের যশোবৃদ্ধিকারী ব'লে অভিহিত করেছেন। কংস এইবাক্য শ্রবণের পরেও নিবৃত্ত না হওয়ায় তিনি বললেন—

ন হন্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ বাসাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িতেঽস্যা যতস্ত ভয়মুত্থিতম্।। (১০।১।৫৪)

আপনার তো দেবকীর থেকে কোনো ভয় নেই, কারণ আকাশবাণীতে তা বলা হয়নি। আপনার ভয় দেবকীর অষ্টমগর্ভ থেকে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, শুধু অষ্টমগর্ভই নয়, আমি দেবকীর সব পুত্রই আপনার হাতে সঁপে দেব। তখন কংস নিবৃত্ত হলেন এবং বসুদেবও প্রীত হয়ে স্বগৃহে গমন করলেন।

দেবকীর প্রথম পুত্র কীর্তিমান্ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব তাকে কংসের হাতে সমর্পণ করলেন কিন্তু কংস সেই পুত্রকে গ্রহণ করতে চাইলেন না। যেহেতু তার থেকে কংসের কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই। এখন নারদ কংসকে বোঝালেন যে, এই দেবতাদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। তিনি বোঝালেন যে, নন্দ, বসুদেব, গোপগণ, দেবকী ও যদুকুলের সকলেই দেবতা। সুতরাং তাদের উপরে খুব ভরসা করা যায় না। তাছাড়া অষ্টম গর্ভের গণনা কীভাবে হবে? প্রথম থেকে পর পরবর্তী গর্ভের গণনা হবে অথবা শেষ থেকে পূর্বপূর্ব গর্ভের গণনা হবে— এর উত্তর কে দেবে। শেষ থেকে গণনা করলে প্রথম পুত্রই যে অষ্টম গর্ভ হবে। তাছাড়া, দেবকীর কতবার গর্ভ হবে, পাঁচটি বা ছয়টি বা আটটি বা আরও বেশি তা কে জানে? সুতরাং প্রত্যেকটি গর্ভের সন্তানই তো অষ্টম গর্ভ হতে পারে। নারদের এমন কথা বলার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দেবকীর যদি এক একটি পুত্র দ্রুত মারা যায় তবে পরপরবর্তী গর্ভের আরও দ্রুত সঞ্চার হবে। ফলে অষ্টম গর্ভের জন্য তার সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করতে হবে না। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁর শক্তি যোগমায়াকে আদেশ করলেন— আমার অংশ যা দেবকীর গর্ভে রয়েছে, তাকে তুমি যোগবলে আকর্ষণ করে বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর।

এবার ভগবান দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করায় দেবকী কারাগৃহ আলোকিত করতে থাকলেন। কংস দেখে বুঝতে পারেল যে, স্বয়ং ভগবান দেবকীর গর্ভে আগত। দেবকীকে হত্যা করার কথাটা কংসের মনে প্রায়ই উঁকি ঝুঁকি দিলেও কংস একাজ করতে উদোগী হয় না। তার কারণ দেবকী গর্ভিণী এবং এই কাজ কংগ্রেসর পক্ষে অত্যন্ত অযশস্কর হবে। এছাড়াও দেবকী স্ত্রীজাতি, তার ওপর সে হলো ভগিনী। ভগিনীর, বিশেষত, গর্ভিনী ভগিনীর নাশ অত্যন্ত নিন্দনীয়। এজন্য কংস সেই পথে অগ্রসর হলো না।

ভগবান দেবকীর গর্ভে সমাগত, একথা সকলেই বুঝে গেলেন। দেবতারা ভগবানের স্তব করলেন। কংসও ভগবানের সহিত শত্রুতাবশত সর্বদা সর্ব অবস্থাতে ভগবানের চিন্তা করতে করতে সর্ব জগৎকে বিষ্ণুময় দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, নারদ, সনক প্রমুখ মুণি দেবকীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে থাকলেন। অন্যে দেখতে না পায় এভাবে দেবগণ দেবকীর সন্নিহিত ভগবানের স্তুতি করে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে অগ্রভাগে নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। ভগবানের জন্মকাল অত্যন্ত সুখকর এবং তার বর্ণনা যেভাবে শুকদেব কর্তৃক উল্লিখিত তা অতি সুন্দর। এখানে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে—

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মার্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।। (১০।৩।১)
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোজ্জুগণোদঘম্।
মহীমঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা...

ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবাহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চদ্বিজাতীনাং শান্তোস্তত্র সমিন্ধত।। (১০।৩।৪)

এর অর্থ অনন্তর সর্বগুণসম্পন্ন অত্যন্ত মনোরম সময় এসে উপস্থিত হলো। তখন ভগবানের জন্মনক্ষত্র রোহিণী উদিত হওয়ায় অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহও প্রশস্ত হলো। সব দিক শান্ত হলো, আকাশে নির্মল তারকাসমূহ উদিত হলো, পৃথিবী মঙ্গলে পূরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গ্রাম, নগর প্রভৃতি সর্ব স্থানই মঙ্গলে পরিপূর্ণ হলো।...বায়ু সুখস্পর্শ হয়েই বয়ে যেতে থাকল ইত্যাদি। এর পরে শুকদেব বললেন যে, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি ভগবানের স্তুতিতে গান করতে থাকলেন। আকাশে দুন্দুভিবাদ্য হতে থাকল। তখনই—

নিশীথে তমোদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
অবিরাসীদ যথা প্রাচ্যাং দিসীন্দুরিব পুষ্কলঃ।। (১০।৩।৮)

রাত্রি অন্ধকারে ঢেকে গেলে এক পবিত্রক্ষণে জর্নাদন দেবরূপিণী দেবকীতে জন্মগ্রহণ করলেন, পুর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের ন্যায় এটি ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। এই পদ্মলোচন বালকের চারটি বাহুতে শঙ্খ চক্র গদাদি আয়ুধে সুশোভিত ছিল। তাঁর বক্ষ স্থল দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী যা শ্রীবৎস নামে প্রসিদ্ধ। গলদেশে ছিল কৌস্তভমণি, তিনি পীতাম্বর, তাঁর শরীরবর্ণ নবজলধর থেকেও সুন্দর। এই শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত না করে পারা যায় না—

তমদ্ভুতং বালকমনম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎলক্ষমং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।। (১০।৩।৯)

বসুদেব কৃষ্ণের স্তুতি করার পরে এবার মাতা দেবকীও ভগবানের স্তুতি করলেন। হে প্রভো, আপনি তো সাক্ষাৎ বিষ্ণু। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হলে মহাপ্রলয়ে সর্বভুবন বিলীন হলে আপনিই বিরাজ করেন। মৃত্যুরূপ কালসর্প পলায়নপর জীবের পশ্চাদ্ধাবন করলে জীব আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করলেই রক্ষা পায়। অথচ আমি উগ্রসেনাত্মজ কংসের থেকে এতই ভীত হচ্ছি কেন? আপনি এর থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে মধুসূদন, আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন তা যেন কংস জানতে না পারে। আমি আমার জন্য তত চিন্তা করছি না। চিন্তা আপনার জন্য। অতএব আপনি আপনার ওই অলৌকিক রূপ গুটিয়ে নিন। আপনার চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভিত হচ্ছে, সেই রূপ আরও প্রকাশ করবেন না। দেবকী এবার গর্ভস্থ ভগবানকে বললেন—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদেব রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়ো জুষ্টং চতুর্ভুজম্।। (১০।৩।৩০)

ভগবান তৎক্ষণাৎ মানব পিতার চোখের সামনে এক সাধারণ শিশুর রূপে দেখা দিলেন। শুকদেব এর বর্ণনা দিয়ে বললেন—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ মম্পাস্যতোঃ মদ্যো বভূহ প্রাকৃতঃ শিশুঃ।। (১০।৩।৪৬)

এদিকে ত্বজা নামক যোগমায়া ভগবানের নির্দেশে নন্দপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন।

এর পরে যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণকে বসুদেবের ক্রোড়ে আনীত দেখে কারাগারের দ্বার স্বয়ং উন্মুক্ত হয়ে গেল ঠিক যেমন সূর্যকে উদিত দেখে অন্ধকার দূরীভূত হয়। মেঘও উপদংশু বা গুড় গুড় করে গর্জন করতে লাগল এবং বৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য শেষনাগ তার ফণা বিস্তৃত করে শিশুকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে বৃষ্টির থেকে রক্ষা করতে লাগল। যদিও আকাশে ঘনঘটা চলছিল তবুও মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্তী যমুনা নদী তার গম্ভীর জলরাশির ঢেউয়ের মধ্যেও মধ্যেও ভগবান কৃষ্ণকে পথ করে দিতে থাকলে যেমন পূর্বে সমুদ্র পথ দেখিয়েছিল সীতাপতি রামচন্দ্রকে লঙ্কা যাওয়ার পথে।

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত শতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ।। (১০।৩।৫০)

বসুদেব দৈববশত নন্দগৃহ চিনতে পারলেন এবং অতিশয় সন্তর্পণে নন্দের শয্যা থেকে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করে কৃষ্ণকে সেই স্থানে শায়িত করলেন। একই পথে বিপরীত গমনের দ্বারা বসুদেব স্বস্থানে ফিরে এলেন এবং পুনরায় মায়ার প্রভাবে রুদ্ধ দ্বারে অবস্থান করতেই লৌহশৃঙ্খল পূর্ববৎ তাদের নিগড়িত করল।

কংসের অনুচরেরা কংসকে সংবাদ দিল যে, তারা দেবকীর কক্ষে শিশুর ক্রন্দন শুনেছে। তৎক্ষণাৎ কংস এসে শিশুকে দেখে উঠিয়ে নিল। এবার দেবকী কাতর কণ্ঠে বললেন— ভাই, আপনি তো আমার পূর্বপূর্ব সন্তানগণকে হত্যা করেছেন। আপনি এখন আমার কন্যাটিকে দিন অর্থাৎ বিনাশ করবেন না।

দেবকীর এই কথা না শুনে কংস এই কন্যার চরণদ্বয় ধরে শিলার ওপরে বলপূর্বক ছুঁড়ে ফেলল। ওই কন্যা হস্ত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বহু অস্ত্রে সুশোভিত অষ্টভুজা রূপে কংসাদি সকলকে দর্শন দিলেন। সেখান থেকেই বললেন—

কিং ময়া হত্যা মন্দ জবেঃখলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংস্রীঃ কৃপণাম্ বৃথা।। (১০।৪।১২)

হে মূর্খ, আমাকে মেরে কী হবে। তোমার বিনাশকারী তো জন্মেছে। তোমার যিনি পূর্বশত্রু অর্থাৎ পূর্বজন্মে যিনি তোমাকে হত্যা করেছিলেন তিনি এজন্মে বিনাশ করবেন, কিন্তু কোনও এক জায়গায় আছেন।

এবার কংস আত্মগ্লানি নিয়ে বলল— শুধু মানুষই যে মিথ্যা কথা বলে তা নয়, কিন্তু দেখছি যে, দেবতারা মিথ্যা কথা বলেন, আর আমি মূর্খ তাই ওই দৈববাণীতে বিশ্বাস করে আমার ভগিনীর পুত্রদের হত্যা করলাম—

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যো এব কেবলম্।
যদ্‌বিশ্রব্ধাদহং পাপঃ সুসুর্ণিহতবাচ্ শিশূন্।। (১০।৪।১৭)

কংসের মধ্যে এখন আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে। বসুদেব ও দেবকীর কাছে পুনঃ পুনঃ আত্মগ্লানির কথা বলতে লাগলেন। ''আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। তোমাদের ক্ষমা ছাড়া আর কোনও আমার শান্তির কারণ নেই।'' শেষে কংস তাঁর ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণদ্বয় গ্রহণ করলেন। ■

# ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নিজেকে শিক্ষক হিসেবে ভাবতে ভালোবাসতেন

**ধীরেন দেবনাথ**

ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শুভ আবির্ভাব দিবস ৫ সেপ্টেম্বর। তবে দিনটিকে ভারতের সমগ্র শিক্ষক সমাজ দলমত নির্বিশেষে একাগ্র চিত্তে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর স্মরণ ও মননে 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালন করে থাকেন। জাতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই শুভ, মহান ও পবিত্র দিনটি সরকারিভাবেও 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে ঘোষিত ও অবশ্য পালনীয়।

১৮৮৮ সালের এই দিনটির এক পুণ্যলগ্নে রাধাকৃষ্ণনের জন্ম তামিলনাড়ুর থিরুথানি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। গ্রামেই স্কুল জীবনের শিক্ষা শেষ করে চলে যান মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই)। সেখানে ভর্তি হন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯০৫ সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ পাশ করেন। অতঃপর তিনি কর্মজীবনে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। তিনি হন 'মানুষ গড়ার কারিগর'। তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, সমাজ শিক্ষিত না হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পরাধীন ভারতে তথা ইংরেজ শাসনে মোটা মাইনের সরকারি চাকরির লোভ উপেক্ষা করে তিনি গ্রহণ করেন যৎসামান্য মাইনের শিক্ষকতা ব্রত। তিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বাংলার সঙ্গেও ছিল তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক। কলকাতার সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে। এছাড়াও তিনি অধ্যাপনা করেছেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে দিয়েছেন ভাষণ— যা সুধীসমাজে হয়েছে প্রশংসিত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁকে কখনও দেখা গিয়েছে দর্শনশাস্ত্রের বক্তা রূপে, কখনও বা কূটনীতিকরূপে। আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক স্তরে বা বহির্বিশ্বে খ্যাতিমান, বিশ্ববিখ্যাত। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থেরও প্রণেতা। অধিকাংশই দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত দার্শনিকও। প্রবাদ আছে, "Philosoply is the mother of all Sciences." তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন এতটাই রবীন্দ্রানুরাগী যে তিনি লিখে ফেলেন— 'দ্য ফিলজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' নামক একখানি গ্রন্থ। ১৯১৮ সালে মহীশূরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিনের সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁকে করেছিল মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত। সেই থেকে তিনি শুধু রবীন্দ্রপ্রেমীই হয়ে ওঠেননি, হয়ে ওঠেন বাংলাপ্রেমীও। আর সেই আকর্ষণেই সম্ভবত তাঁর বাংলায় আগমন। তাই বাঙালি হিসেবে আমরাও তাঁর জন্য গর্বিত।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আর রাধাকৃষ্ণন ছিলেন প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। ১৯৬২ সালে তিনি অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রপতি পদ। একজন শিক্ষক হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, যা শিক্ষক সমাজের কাছে এক গর্বের বিষয়। তিনি উচ্চশিক্ষিত হলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হননি। পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি ছিলেন ষোলআনা ভারতীয়। আবার মানসিকতা ও আচার-আচরণেও ছিলেন তাই। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তাঁর রচিত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক কিছু গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক, দার্শনিক, ধার্মিক, জ্ঞান-তাপস, সারস্বত সাধক, বাগ্মী, পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, কূটনীতিক, দেশভক্ত ও জাতীয়তাবাদী এবং অন্যদিকে ছিলেন রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধান। তাই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভারতীয়ত্ব ও দেশসেবার

স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে তাঁকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে। একজন মানুষের মধ্যে এত গুণের সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। তবে এত পরিচিতির মাঝেও তাঁর বড় পরিচয়— তিনি একজন 'শিক্ষক'। দেশ, জাতি ও মানুষ গড়ার মহান কারিগর।

১৯৬২ সাল। তখন রাধাকৃষ্ণন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তাঁর কিছু গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও প্রিয় বন্ধু তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সামগ্রিক ভাবে দিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালনের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে সবাই খুশি হন এবং তা খুশিমনে মেনেও নেন। আর এটাই হচ্ছে 'শিক্ষক দিবস' প্রচলনের ইতিহাস। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে 'শিক্ষক দিবস'-এর প্রবর্তক মূলত রাধাকৃষ্ণনই।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, নিজের ব্যক্তিগত সুনাম অর্জনের স্বার্থে নয়, তিনি চেয়েছেন সমগ্র শিক্ষক সমাজকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করতে। সত্যি বলতে কী, রাধাকৃষ্ণন ছিলেন এমন এক মহান ব্যক্তি, যিনি কখনই নিজের স্বার্থে কিছু করেননি— যা কিছু করেছেন তা পরার্থে, সমাজ ও দেশের স্বার্থে। মহান ব্যক্তিরা এমনটাই হন। তাইতো তিনি 'শিক্ষক দিবসে' স্মরণীয় ও বরণীয়। অতঃপর ৬২ সাল থেকেই 'শিক্ষক দিবস' পালিত হয়ে আসছে।

একজন 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে নয়, একজন 'শিক্ষক' হিসেবে নিজেকে ভাবতে ভালোবাসতেন রাধাকৃষ্ণন। একথা তিনি স্বীকারও করেছেন বহুবার। কারণ তিনি জানতেন, শিক্ষকরা হচ্ছে 'মানুষ গড়ার কারিগর'। আর শিক্ষা হচ্ছে 'জাতির মেরুদণ্ড'। তাই শিক্ষা যদি না থাকে, মানুষই যদি গড়ে না ওঠে তাহলে জাতির মেরুদণ্ড খাড়া থাকবে কী করে। কাজেই শিক্ষকদের একমাত্র দায়িত্ব, কর্তব্য ও ব্রত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করা। কোনো দেশ বা জাতি কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ তা নির্ভর করে সেই দেশ বা জাতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কতটা উন্নত তার উপরে। তাই শিক্ষকতা এক কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্রত। যদিও দেশ ও জাতি গঠনের গুরুদায়িত্ব শিক্ষকদের উপরই ন্যস্ত। তবে পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭১ বছর পরেও ভারতবর্ষ শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট পিছিয়ে। এ রাজ্যেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একদা এরাজ্য ছিল শিক্ষায় সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে। আর আজ? শিক্ষার স্থান তলানিতে। তবে এর জন্য দায়ী শিক্ষায় রাজনীতিকরণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেন এক একটি রাজনীতির আখড়া। ছাত্র ইউনিয়নের দখল নিতে শাসক ও বিরোধী দলীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটছে সংঘর্ষ। ফলে ঝরছে রক্ত, শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে রক্তাক্ত। এমনকী হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। নিস্তার পাচ্ছে না শিক্ষাগুরুরাও। মতের অমিল হলেই তাঁদের হতে হচ্ছে অপমানিত ও নিগৃহীত, কখনওবা রক্তাক্ত। তাই শিক্ষাঙ্গনগুলি পরিণত হচ্ছে নরককুণ্ডে। তাছাড়া ছাত্র ইউনিয়নগুলি শাসকদলের ছাত্রদের দখলে থাকায় এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী দুষ্কৃতী অঢেল টাকার বিনিময়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করিয়ে দিচ্ছে। ফলে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন সহিংসতা, নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও শাসক দলের ছাত্রদের একাধিপত্য শিক্ষার ঘটাচ্ছে 'অন্তর্জলি যাত্রা।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুক্ষেত্রে শাসকদলের এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী ওই সব কুকর্মের সঙ্গে জড়িত। তাই প্রশ্ন, মানুষ গড়ার কারিগরদের মেরুদণ্ড যদি এভাবে ভেঙে দেওয়া হতে থাকে তাহলে জাতির মেরুদণ্ড আর খাড়া থাকবে কি? মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে কি বাঙালি? তবুও শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষক সমাজকে তাঁদের উপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে যেতেই হবে। কারণ শিক্ষা নিছক কোনো পেশা নয়, বরং শিক্ষা হচ্ছে পরম ত্যাগ, সেবা ও ব্রত। সত্যি বলতে কী, শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের অন্ধমনে জ্বালিয়ে দেন জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, যে আলো তাদের পথ দেখিয়ে যায় সারাজীবন। আজকের শিশুকে আগামীদিনের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদেরই। তাঁরাই পারেন সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং কুসংস্কারমুক্ত এক সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে। তাই শিক্ষককুল শুধু ছাত্র, সমাজ ও জাতির পথপ্রদর্শকই নন, সমাজ সংস্কারকও বটে। চরিত্রবান সমাজ গঠনের কর্মযজ্ঞের পুরোহিত তাঁরা। তাই তাঁরা সমাজে নমস্য।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৯ সাল থেকে কৃতী শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের 'জাতীয় শিক্ষক'-এর সম্মান জানিয়ে আসছে। আবার ১৯৯৫ সালে UNESCO 'শিক্ষক দিবস'-এর মান্যতা দিয়েছে। তবে শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতির বাইরে রেখে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ সম্মিলিতভাবে শিক্ষার উন্নয়নে শামিল হলে রাধাকৃষ্ণনের আদর্শকে স্মরণ ও মনন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তথা মহান 'শিক্ষক দিবস' পালন হবে সার্থক। আর তাঁর স্বপ্নও হবে সফল।

*(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)*

## বিজ্ঞপ্তি

**স্বস্তিকা-র গত কয়েকটি সংখ্যায় স্বস্তিকার প্রতি কপির ও বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বৃদ্ধির যে ঘোষণা করা হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি মারফত না জানানো পর্যন্ত স্বস্তিকার দাম ও গ্রাহকমূল্য একই থাকবে।**

**— সম্পাদক, স্বস্তিকা**

# আদর্শ, কর্তব্য

শেখর সেনগুপ্ত

সুলেখা ঘোষ দে। একডাকে তেজগঞ্জের সকলে চেনে। এলাকার একমাত্র গৃহবধূ, যে একটা ডিপার্টমেন্টাল গুডসের দোকান দাপটে চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় মাস আষ্টেক ধরে। গলায় পুরুষালি স্বর। লম্বায় ফুট পাঁচেকের বেশি নয়। গায়ের রঙ ফর্সা নয়। রূপচর্চায় আসক্তি কম। দুই চোখ সতর্ক চঞ্চল হলেও কখনও কখনও দৃষ্টি কোথাও বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। স্বামী কৈলাশ দে, বয়সে তরুণ, কর্কটরোগের শিকার, বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্ত্রীর ব্যস্ততা নিরীক্ষণ করে... সহসা ওই বাড়ি থেকে কান্নার রোল যে কোনও সময় উঠতে পারে। কালে-ভদ্রে 'উন্নয়ন'-এর রব শোনা গেলেও, তেজগঞ্জের সিকিভাগ আজও নিতান্ত এঁদো। বেকার যুবকদের সংখ্যা অনেক। সন্ধ্যায় তাদের মদ্যপানের আসর। দিনের বেলায় দু' চাকার গতিমত্ততায় দুরন্ত ভবঘুরে। সিন্ডিকেটিয় দাপটে হৃদরোগের শিকার হতে পারে মধ্যবিত্তরা।

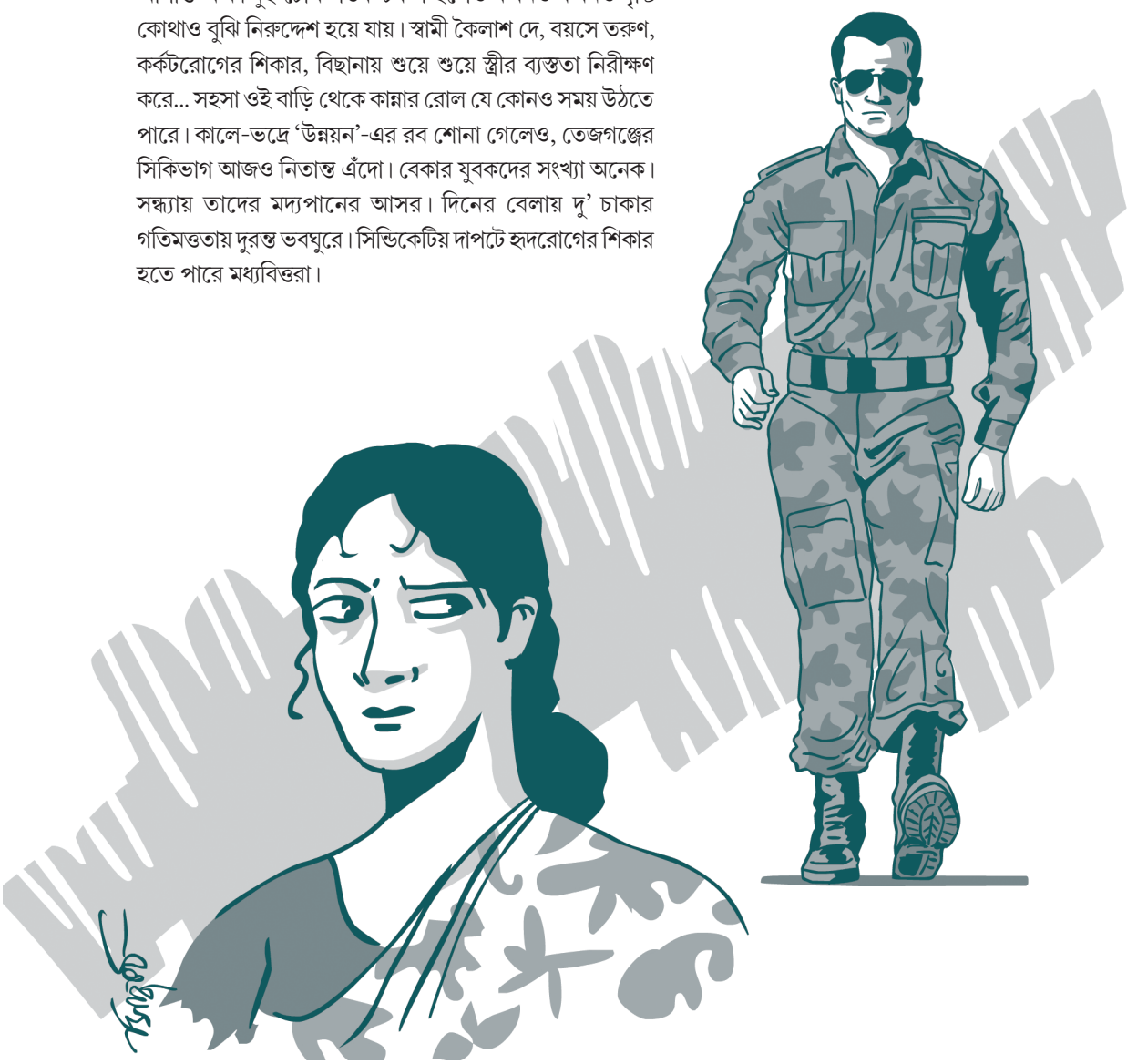

সুলেখা যে দোকানের মালকিন, নাম তার 'হিজিবিজি'। নাম ওরকম হলে কী হবে, অধিকাংশ গৃহস্থ নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদা একবার পেশ করতে পারলে পরক্ষণেই হুকুম বের হবে মালকিনের গলা চিরে। উদ্দেশ্য তিন কর্মচারীর যে কোনও একজন— নকুল পাশোয়ান, চিত্ত গুঁই, নরেশ পুরকায়েত। এরকম গৃহবধূ হাজারে একটা মেলে কিনা, সন্দেহ। এমন এক পরিবারের বধূ, যেখানে রয়েছে কর্কটরোগের ধারাবাহিকতা। শ্বশুরের মায়ের মৃত্যু ক্যান্সারে, শ্বশুরও চোখ বুজলেন ওই একই রোগের শিকার হয়ে, এখন বাড়ির বড় ছেলে কৈলাশ, সুলেখার স্বামী, দিন গুনছে কর্কটের মরণকামড় সহ্য করতে করতে। এরপরও একে যারা জিনগত ব্যাধি বলে স্বীকার করে না, তাদের সিদ্ধান্তের ওপর কি আস্থা রাখা বিধেয়?

ঝট ঝট শব্দে শাটার নামল। নকুল পাশোয়ান শাটারে চাবি লাগিয়ে মালকিনের হাতে তা তুলে দেয়। এরা যখন দ্বিতীয় পর্বে শাটার তুলবে তখন এলাকায় সাদা ও রঙিন আলোগুলি জ্বলে উঠবে। রিকশাচালক নাসির যথাসময়ে তার তিন চাকা নিয়ে হাজির। সুলেখা উঠে বসে। চাকা ঘোরে। গন্তব্য আলমগঞ্জ থেকে তেজগঞ্জ। দূরত্ব, কেউ বলে দেড় কিলোমিটার, কারোর হিসেবে সোওয়া এক কিলোমিটার। তেজগঞ্জের বল-ভরসা-আশার সঞ্চার বলতে মাত্র গোটা তিনেক চিড়ের মিল। আপ-খোরাকি জোগায় বাকিদের নিছক রাজনৈতিক গ্রুপবাজি। সুলেখা যখন ছিল মিস সুলেখা ঘোষ, স্বপ্নেও ভাবেনি তার আদত জীবনসংগ্রামটা শুরু হবে এই তেজগঞ্জে। তার বিয়ের জন্য বাবা এমন অধীর হয়ে ওঠেন...! সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবার তো। তিন কন্যার মধ্যে সেই সকলের বড়। একটাই তক্তাপোশে তিন মেয়ের রাত্রিযাপন। বাপ পোস্টাল পিওন। সুলেখার মেধা যে পাতে দেবার মতো ছিল না, একথা বলা অনুচিত। এইচ এস-এ যে নম্বর পেয়েছিল, তাতে বর্ধমান রাজকলেজে ইতিহাসে অনার্স নিতে অসুবিধে হয়নি। বাবুরবাগের ডেরা থেকে পায়ে হেঁটে কলেজ করতে জীবনীশক্তি হারায়নি এক ফোঁটাও। গ্র্যাজুয়েশন যে কমপ্লিট করা আর হয়নি, সেকথা আলাদা। প্রথম প্রথম এই নিয়ে বিচলিত হলেও এখন আর পিছন দিকে ফিরে তাকাবার পাত্রী যে নয়। তার তাবৎ দুশ্চিন্তা কর্কটরোগে আক্রান্ত শয্যাশায়ী স্বামীকে নিয়ে— যার শিয়রে সাক্ষাৎ শমন, আরোগ্যলাভের ন্যূনতম সম্ভাবনা নেই।

অমন সাততাড়াতাড়ি বিয়েটা যে হয়ে যাবে, কলেজছাত্রী সুলেখার কাছে তা ছিল অভাবনীয়। বিপদের ঘণ্টাটা বাজিয়ে ছিলেন বাবাই। তাঁর বেশি বয়সে বিয়ে, পর পর তিনটি কন্যা, তারপর রিটায়ারমেন্টের সময় এসেছে ঘনিয়ে। চাকরি তো পোস্টাল পিওনের। ঝড়-জল-রোদে সাইকেলে টো-টো, শেষের দিকে খাওয়া কমে আসছিল, ভরপেট হলেই ঘুম ঘুম ভাব। শহরের প্রান্তসীমায় অফিস, প্রমোশন হলে কোন বনবাদাড়ে যেতে হবে, ঈশ্বর জানেন। তিন কন্যা! আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। অবসর নেবার আগেই অন্তত বড় মেয়েটার বিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু পাত্র কোথায়? এ যা মেয়ে, প্রেমের চতুষ্কোণে আবদ্ধ হতে চায় না বোধহয়। আবার বিয়ের কথা শুনেই কেমন থম্ মেরে গেল। না করেনি। অথচ চোখ ছল ছল। দুটো কাগজে গাঁটের কড়ি খসিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন বাবা। মা আবার অভিনিবেশ সহকারে ওই দুই বিজ্ঞাপনের দরুন আগত চিঠিগুলি পড়ে চলেছেন।

এ রকম যখন পরিস্থিতি, তখন প্রথম যে গণ্ডির একটু বাইরে পা রেখেছিল সুলেখা। কলেজ লাইব্রেরিতে বসেই সে নোট তৈরি করত অনার্সের। নাগালে রয়েছে দরকারি বই। বাড়িতে তো এ সুযোগ নেই। চেয়ার, টেবিল, স্পেস...সর্বত্র অপ্রতুলতা। সন্ধ্যায় তো নির্ঘাত, দিনের বেলাতেও মশার বিনবিনানি। কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াশোনার পক্ষে পরিবেশ অনেক নিটোল। হ্যারল্ড ভিনাকের বইয়ের পাতায় প্রদক্ষিণ করছিল সে, হঠাৎ বুঝতে পারে, তার পাশে কে একজন এসে বসল। সসেমিরা অবস্থায় পৌঁছে যাবার মতো ব্যাপার নয়। যে বসেছে, সে কেবল তার সহপাঠী নয়, যে চৌদ্দজন ছাত্র-ছাত্রী হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে, তাদেরই একজন। রজত দে। বলিষ্ঠ চেহারা, দৈর্ঘ্যে ছ' ফিটের কাছাকাছি, গায়ের রং বেশ কালো, স্বল্পবাক হলেও সময় সময় এমন সপাটে হেসে ওঠে যে তাজ্জব হতে হয়।... সেই শুরু। ফরাসি বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মেয়াদ মাত্র কয়েকদিনের। তার মধ্যে নীরব মুহূর্তই বেশি, যদিও দু'জনেরই শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ— ক্লাসরুমে বসেও পাখির নাক শুনতে পায়। কোনও এক মুহূর্তেও হাতে হাত রাখেনি, অনুরাগের প্রকাশ দূরঅস্ত। অথচ স্মৃতির পোট্রেটে দিনগুলি অতি স্পষ্ট। বিশেষত সেই দিনটা। এপ্রিলের দাবদাহ। প্রকৃতির যত্ন-আত্তি বলতে কিছু নেই। আকাশ অসম্ভব নীল। বর্ষার প্রজেক্ট নীরবে তৈরি হচ্ছে। কলেজে অফ পিরিয়ড। সুলেখা ও রজত কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছে। রাজকলেজের সামনে প্রকাণ্ড দিঘি সামসায়র। অতবড় দিঘি তো আর কষ্টেসৃষ্টে তৈরি হয় না। বর্ধমানের মহারাজা কয়েক বছর সময় নিয়েছিলেন এই বিশাল জলাশয়টা গড়ে তুলতে। নানারকম চিন্তাভাবনাও ছিল নিশ্চয়। এখন এই দিঘির চারদিকে বড় বড় বাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশন, জেলা হাসপাতাল, রাজকলেজ, নামি দামি সমস্ত ডাক্তারদের বাড়ি— অপার গুরুত্ব। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সেই প্রথম রজত সুলেখার একখানা হাত ধরেছিল। না, কোনও বোঝাপড়ার জন্য নয়, শুধু একটা অপ্রকাশিত খবর দেবার জন্য, 'সুলেখা, আমাকে এবার লেখাপড়ার ওপর দাড়ি টানতে হচ্ছে।'

'মানে?'

'আমি আর্মিতে জয়েন করতে যাচ্ছি।'

'সে কী!'

'নিজের অজান্তেই একটা ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। পরে বুঝলাম, এ হচ্ছে দেশমাতৃকার ডাক। বিশাল সীমান্ত জুড়ে হানাদারির আশঙ্কা। সেই আশঙ্কাকে

উৎখাত করবার ব্রত যারা নিয়েছে, আমি তাদের একজন হতে চাই। কাউকে না জানিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি, লাইনে দাঁড়িয়েছি। সিলেক্ট হবার বার্তা পেলাম।'

টানা বলেছিল রজত। যদিও ভাবের আদান-প্রদান প্রকাশ্যে হয়নি, সুলেখা কমবেশি প্রমাদ গুনেছে। রাতে ঘুম আসেনি। বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়েছে, কেটে গেছে ঘণ্টা কয়েক, পুনর্বার ফিরে গিয়েছে ঘুমন্ত দুই বোনের কাছে। বিভিন্ন চিঠি ও বিবরণ হাতড়ে হাতড়ে নিজেই বেছে নিয়েছিল এই ব্যবসায়ী পরিবারটিকে। শ্বশুর গত হয়েছেন। শাশুড়ি ধর্মপ্রাণা। দুই ভাই। বড় ভাইই পাত্র— ব্যবসার জোয়াল কাঁধে। ছোটভাই ডিফেন্স সার্ভিসে। পাত্র কৈলাশই এসেছিল সবান্ধব কনে দেখতে। ফ্রয়েডিয়ান ভাবনা খুব একটা হয়তো ছিল না। একটি মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে— ব্যাস, এইমাত্র।

পাত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন খানিকটা অবাক হয়েছিল বৈকি সুলেখা। এ অবয়ব যেন পরিচিত। কিন্তু...ঈশ্বরের কী অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা! রহস্যের পর্দা ফাঁস হয় শ্বশুরবাড়িতে পা রাখতেই। কৈলাশ রজতেরই বড় ভাই। রজত পারিবারিক ব্যবসাতে নিজেকে জড়াতে চায়নি। চাইলে, হয়তো নাজেহাল হতো। তার চিন্তা, ভাবনা ও আদর্শের পরিধি এত বড় যে তাকে মাপতে বসলে তটস্থ হতে হবে। দেশ, ধর্ম, জাতি, কৃষ্টি এই সকলে ঘুরপাক-খাওয়া একটি অসচরাচর যুবক। আদর্শের টানে লেখাপড়ায় ইতি ঘটিয়ে সেনাদলে যোগ দিয়েছে, যদিও অধিকাংশ শুভানুধ্যায়ীর বিরূপ মন্তব্য হজম করতে হয়েছে তাকে। এমন ছেলে যে বড়ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের নিবিড় আনন্দেও যোগ দিতে আসেনি বা আসতে পারেনি মিলিটারির কঠোর নির্দেশ থাকায়। ট্রেনিং শেষ হলেই যেতে হয়েছে ছত্তিশগড়ের বস্তারে মাওবাদীদের নিকেশ করতে। তবে ভাবী বউদির পরিচয় সে পেয়েছে। তার দাবি মেনে মা পুত্রবধূর একখানা ছবিও পাঠিয়েছেন। মালাবদলের সময়ও সুলেখার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই এক ভাবনা— অনুষ্ঠানে রজত যদি উপস্থিত থাকতে পারত, পরিস্থিতির রূপ ও অপরূপকে সে হয়তো অন্যভাবে শনাক্ত করতে বাধ্য হতো। কৈলাশের ঘরনি হিসেবে নিজের পুনর্নির্মাণ এমন ভাবে করতে চায় সুলেখা, যাতে পারিবারিক ভারসাম্য অটুট থাকে।

বিয়ের ন'দিনের মাথায় রজতের খামটা এল ডাকযোগে। একখামে তিন খানা চিঠি। মা, দাদা এবং বউদিকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সেই পরিচিত হস্তাক্ষর। বিষয়ের ওপর ভর দিয়ে সুঠাম অক্ষর সাজিয়েছে রজত। সুলেখাকে লেখা চিঠি মোটেই দীর্ঘ নয়, কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব অনুভবে আসে চিঠিটা পড়বার সময়।

'...অবশেষে তুমি আমার পূজনীয়া বউদি হয়ে এলে।... আমি উদ্দীপিত। কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্যে ও আদর্শে ডেস্টরশন আনা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং প্রতীক্ষা করি, কবে বাড়িতে গিয়ে তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারব। ব্যাপার খুব প্রাণবন্ত হবে। তাই না?...'

এতদিনে সেই প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। ঝড়ের বেগে চলে গেল যে সময়— সেখানে যেন কোনও অপরূপ অনুভূতি নেই। হাতের ভাষায় কত যে হুঁশিয়ারি ছিল, বিয়ের আগে তা নিয়ে তো কোনও চর্চা করা হয়নি। স্বামী কৈলাশের শরীরে রকমারি চোরা জ্বালা- যন্ত্রণা ছিল। অবশেষে ধরা পড়ল, তার কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার। সিগারেট ছেড়ে দিতে হলো। চলল কেমোথেরাপি। শরীরটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে নড়বড়ে মাংসপিণ্ড। সুলেখা বেশিরভাগ সময় অন্যমনস্ক। শাশুড়ির বিলাপ শোনা যায় ক্ষণে ক্ষণে। বার্তা পেয়েও 'আসব-আসব' করে আসতে পারেনি রজত। চৈনিক হানাদারির মোকাবেলায় বরফের ওপর সে অতন্দ্র। যেতে হলো মহারাষ্ট্রের সীমানায় মাওবাদীদের গুটিকয়েক ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে...ইত্যাদি। ব্যবসার তাবৎ দায়িত্ব বহনে সুলেখা পিছিয়ে আসেনি। আচার-আচরণে সে আরও পুরুষালি। তার শরীর থেকে পারফিউমের বদলে ঘামের গন্ধ বেরিয়ে আসে। এলাকায় তাকে নিয়ে প্রশংসাসূচক চাপাগুঞ্জন। সিন্ডিকেটীয় বেলুনমার্কা ছোকরাদের দেখলেও সে বিব্রত বোধ করবার পাত্রী নয়। পাত্তা দেয় না। নিশানা সামনের দিকে।... অবশেষে কাল রাতে রজত যে বার্তা দিল, তাতে হাততালি দেবার আনন্দ না থাকলেও স্বস্তি ও গৌরব ছিল। ছিল আনন্দও। রজতের প্রমোশন হয়েছে। কাল সন্ধ্যার মধ্যে যে অবশ্যই দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে আসছে। কৈলাশ ও শাশুড়ির চুপসে যাওয়া ভাব কেটে যায়। অনেকদিন বাদে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সুলেখা। বাড়িতে আত্মপ্রত্যয়ের আবহ বিলক্ষণ।

রিকশ চলছে দুলকি চালে। চাকা তিনটে নড়াচড়া করছে মাত্র। পথের দুর্দশা কহতব্য নয়। পুরসভা নিরুত্তাপ। সমানে চলছে বৃক্ষনিধন। পরিবেশ ক্রমেই কিম্ভুত। মানুষ ও বাইকের চলাচল বাড়ছে। সুলেখার মুখ তবুও অন্যদিনের মতো বেজার নয়। বিরক্তি, ব্যস্ততা, সম্মান, প্রত্যাশা, বাস্তব, স্বপ্ন— সবই হয়তো ঘুরছে নাগরদোলার চরকি হয়ে।

সুলেখার হাতব্যাগে ঘুমন্ত মোবাইলটা জেগে ওঠে। রবিঠাকুরের গান। কানে চেপে ধরে সুলেখা, 'হ্যালো।'

'...ও আমার বউদি গো, আমি তোমার দেবর— শ্রীমান রজত দে।...'

'ফাজলামি করবে না। কখন আসছ?...'

'আরও দিন কুড়ি বাদে।...'

'হোয়াট? কেন? এরকম—।'

'আমাকে ইচ্ছে মতন কান মলে দিও। এখন খুব বড় কর্তব্য ও আদর্শের ডাক এসেছে গো। ব্যক্তিগত বাসনাকে তুলে রাখলেই হবে। ...ফ্লাইট ধরে দিল্লি। সেখান থেকে শ্রীনগর। অমরনাথমুখী ভক্তিআপ্লুত তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে যে। ভেবে দেখ বউদি, এর চেয়ে বড় কর্তব্য, এর চেয়ে বড় আদর্শ আর...'

সুলেখার মুখে কথা নেই। কিন্তু দুই চোখ দেখলে মনে হতে পারে, এই কথাগুলি শোনবার জন্যই সে যেন উদগ্রীব হয়েছিল। ■

# স্বামী অখণ্ডানন্দের কৃষি ভাবনা

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দও বিখ্যাত পুরুষ। তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সেবাধর্মের সূচনা করেন। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের সারগাছি-মহুলা অঞ্চলে তিনি স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শাখা। হিমালয়ে যাওয়ার পথে সেখানকার দুর্ভিক্ষ দেখে সেখানেই থেকে গিয়ে সেবাকাজ শুরু করেন। ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি সারগাছি স্টেশনের অদূরে স্থাপন করলেন স্থায়ী আবাস। উলুখড়ে ভরা জমিটি তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সবুজ বাগান ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হলো। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবা করতে এসে তৈরি করলেন এক স্বর্গীয় অন্নসত্র। সেই প্রতিষ্ঠান আজ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জমি কেনার পর দণ্ডী মহারাজ ( স্বামী অখণ্ডানন্দ সারগাছি অঞ্চলে এই নামে পরিচিত ছিলেন) তার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটিকে প্রথমে চাষ-আবাদ করতে উদ্যোগী হলেন। উদ্যোগী হলেন পুষ্পোদ্যান সাজাতেও। প্রাণপ্রিয় গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু গোলাপ পছন্দ করতেন তাই নানান রংয়ের গোলাপের বাগান তেরি করে ফেললেন। আবাসিক অনাথ ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করলেন সবজি বাগান। স্থায়ী জমি তৈরি হবার আগে যে যে জায়গায় ছিলেন সেখানেও উদ্যান রচনা করিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠিতে লিখেছেন, '' আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, এই অনাথ আশ্রমটি সেল্ফ সাপোর্টিং হয়। অনাথ বালকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে আবাদ করাইতে পারিলেই আশ্রমস্থ বালকগণের শ্রমলব্ধ ধনেই

আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে।" তিনি অনাথ বালকদের পড়াশুনার পাশাপাশি দর্জির কাজ ও কাপড় বোনার কাজ শিখিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে আশ্রমে মোট ১১ জন অনাথ বালক ছিল।

সারগাছি মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের লেখা ৬৫০ টি চিঠি অনুধ্যান করলে দেখা যায়, তিনি আশ্রমের কাজকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতেন। বেলুড় মঠের নির্দেশিত কাজকর্ম ছাড়া তিনি আশ্রম ছেড়ে থাকতে চাইতেন না। এমনকী তিনি কৃষি মরশুমে মনোরম তীর্থক্ষেত্র ও নিসর্গ-নিবিড় ভ্রমণের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এলাকায় কৃষির উন্নয়নের জন্যও তিনি সক্রিয় থাকতেন। ছায়াবাজি বা ম্যাজিক লন্ঠনের মতো ভিস্যুয়াল স্লাইড তৈরি করে আধুনিক কৃষিকাজে কৃষকদের সচেতন করতেন। আজকের বেলডাঙ্গা, ভাবতা, সারগাছি, বলরামপুর অঞ্চলে সবজি, পাট এবং তৈলবীজ চাষের যে ব্যাপক বিস্তার তার অনুপ্রেরণা স্বামী অখণ্ডানন্দ।

তাঁর চিঠিপত্র পড়ে দেখা যায়, আশ্রমে চাষের জন্য তিনি মায়াবতী থেকে বড়ো জাতের কুমড়া, বরবটি ও শিমের বীজ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের আমিনপুর ও ঢাকা থেকে ভালো জাতের ওলের বীজ, গোয়ালন্দ থেকে তরমুজের বীজ, কলকাতার নার্সারি থেকে তরমুজ, বিট, শালগমের বীজ এবং ময়মনসিংহ থেকে বেগুনের বীজ আনিয়েছিলেন।

এক সময় রাজ্য কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক হিসেবে আমার পোস্টিং ছিল বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের বেলডাঙ্গা উপ গবেষণা কেন্দ্রে। সেসময় সারগাছি মিশনের প্রধান ছিলেন স্বামী অনাময়ানন্দজী মহারাজ। তাঁর সম্মতিতে আমি সারগাছি আশ্রমে থাকার সুযোগ পাই। তখন আশ্রমের বালকদের পড়াতাম ও কৃষিকাজ দেখাশুনা করতাম। প্রায় একবছর সেখানে থেকে আশ্রমের দিব্য পরিবেশ লাভের ও গ্রামবাসীদের কৃষি-কৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। সারগাছি তপোবনে বসবাস আমার জীবনের একটি স্মরণীয় তপস্যাকাল।

**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী**

## ভারতের পথে পথে

# শ্রীশৈলম্

পুণ্যসলিলা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ পাড়ে মহাভারতে বর্ণিত শ্রীপর্বত পাহাড়ে দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন স্বামী। শ্রীপর্বতের বর্তনাম নাম ঋষভ পাহাড়। চতুর্দশ শতকে এখানে মন্দির নির্মিত হয়। শিবলিঙ্গের মাথায় সোনার নাগরাজ মুকুটরূপে বিরাজমান। মন্দির প্রাচীরে সারা বছর ধরে সেবাকাজ চলে। পাহাড় চূড়োয় ব্রহ্মরম্ভা রূপে দেবী মহাকালীর মন্দির রয়েছে। জনশ্রুতি, শিবের বাহন বৃষভ এখানে প্রায়শ্চিত্ত করে। তুষ্ট হয়ে শিব ও পার্বতী মল্লিকার্জুন ও ব্রহ্মরম্ভা রূপে বৃষভের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। নানান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালে কালে মন্দির সমৃদ্ধ হয়েছে। ৫১ সতীপীঠের অন্যতম শ্রীশৈলম্। দেবীর গ্রীবাংশ পতিত হয়েছে এখানে। কাছেই রয়েছে সাক্ষী গণপতির মন্দির।

## জানো কি?

- ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম জম্বুদ্বীপ।
- এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।
- রাষ্ট্রীয় ভাষা নেই।
- সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ২২ টি।
- রাজ্য ২৯ টি, কেন্দ্রশাসিত ৭ টি।
- উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার ৩২১৪ কিলোমিটার।
- পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ২৯৩৩ কিলোমিটার।
- সবচেয়ে বড়ো রাজ্য রাজস্থান।
- সবচেয়ে ছোটো রাজ্য গোয়া।

## ভালো কথা

# কেরলে বন্যা

ভারতের একেবারে দক্ষিণের রাজ্য কেরলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। টিভিতে দেখার পর থেকে আমার মন খুব খারাপ। সেখানে আমাদের সেনাবাহিনী দিন-রাত পরিশ্রম করে বন্যাদুর্গত মানুষদের উদ্ধার করছে। সেদিন বিকেলেই দেখি পাড়ার দাদারা কেরলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। বাবা বললেন এদের দিলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। পাড়ার সবাই দিচ্ছে। বড় ব্যানারে 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি' লেখা রয়েছে। আমার জমানো পয়সাগুলি আমি দাদাদের দিলাম। দাদাদের সঙ্গে আমিও পাড়ায় ঘুরলাম। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। মা একটু রেগে গিয়েছিল। বাবা বলল, ওতো ভালো কাজেই গিয়েছিল। তখন মা হেসে ফেলল।

**প্রিয়ম দত্ত, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## ছোটদের কলমে

### মাতৃভূমি

**মৌনব দাস, সপ্তমশ্রেণী,** তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬

এদেশ আমার জন্মভূমি
ভারত তাঁর নাম,
বিশ্ববাসী সকলেই
করে তাঁকে প্রণাম।
করব আমরা বিশ্বজয়
এই নিয়েছি প্রতিজ্ঞা,
মুচি হোক বা মেথর হোক
সবার থেকে নিই শিক্ষা।

আমার দেশ আমার প্রাণ
দেশের আমি রাখব মান,
আমার আলো শুধুই তুমি
তুমি আমার মাতৃভূমি।
তোমার কাজে মরা বাঁচা
সবই তোমার কাজে
এই আশিস দাওগো তুমি
যেন থাকি তোমার পাশে।

*এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২৪

অভিমন্যু সবাইকে রুখে দেন।

কর্ণকে নতুন করে আক্রমণ করেন।

কর্ণকে পিছু হটতে হয়।

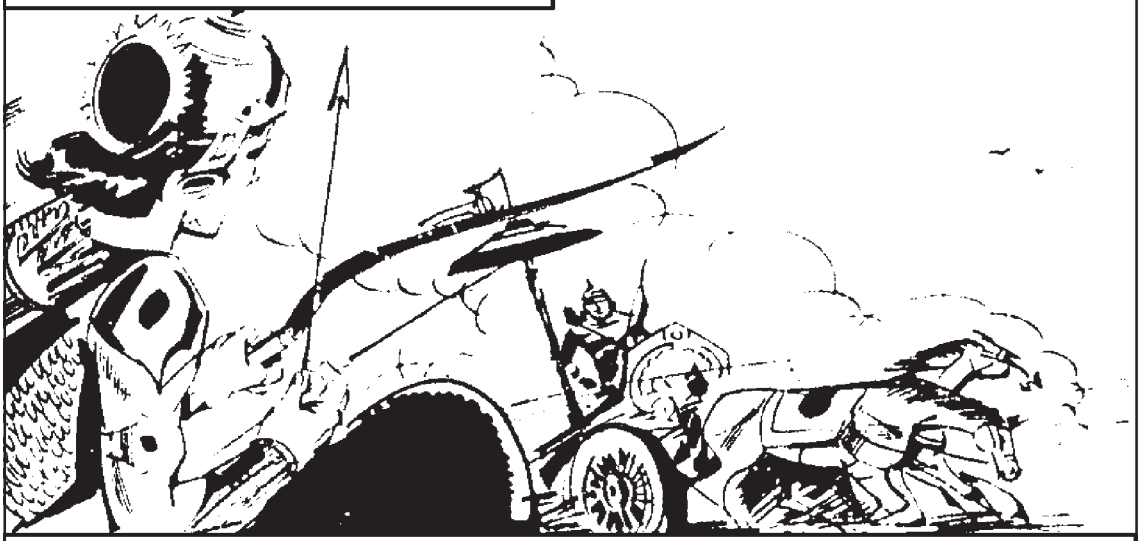

দুর্যোধনের ছেলে লক্ষণের বীর বলে খ্যাতি ছিল। এবার সে কৌরবদের মান বাঁচাতে এগিয়ে যায়।

ক্রমশঃ

# এক মহাপ্রাণ মানুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ

**সংকর্ষণ মাইতি**

কলকাতার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্ত।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কবি অটলবিহারী বাজপেয়ী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যেবেলায় খবরটা পাওয়ার পর টিভিতে চোখ দুটি আমার নিবদ্ধ ছিল। অন্তরের অন্তঃস্থলটা তখন তোলপাড় হচ্ছে। দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসছে। রাজনীতিকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি চলে গেলেন!

১৯৯৩ সালে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (ইন্ডিয়া)-এর দ্বিবার্ষিক সভা হয়েছিল ২৭-২৯ জুন। ২৮ জুন একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন তিনি। আলোচনার সঞ্চালনায় ছিলেন শ্যাম খোমলাজী। তিনি মঞ্চে ডেকে নেন আনন্দবাজার পত্রিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক অরুণ বাগচীকে— যাঁর শিক্ষা বিলেতে। প্রথমেই ভাষণ অরুণবাবুর। ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বাজপেয়ীজীকে টেনে আনেন। 'ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী' এই কথাটি যেই না তিনি উল্লেখ করেছেন, অমনি সভাস্থলের ছ'শো সাংবাদিক করতালি দিলেন। তখনই বুঝতে পারলাম, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাংবাদিকরা তাঁকে দেখতে চান।

শুধু যে অরুণবাবু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন তা নয়, ১৯৮০ সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির অঙ্কুর বিকশিত হচ্ছে তখন বোম্বাই অধিবেশনে এম. কে. চাগলা সভাপতি অটলজীকে দেখে বলেছিলেন—

'দল এখনও বর্ধিত হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর রূপ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'...আরও আগে, ১৯৫৭ সালে জওহরলাল নেহরুর মন্তব্যটি ছিল এই রকম—'এই ছেলেটি একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে।'

যাইহোক, অটলবিহারী হিন্দিতে ভাষণ দিলেন হেসে হেসে। তাঁর রসবোধের কথা তো সর্বজনবিদিত। সাংবাদিকরা বক্তব্য শুনে হেসেই যাচ্ছেন। এহেন মানুষটির একেবারে কাছে গেলাম। মঞ্চে সভার শেষে। সবাই নেমে গেছেন, সিকিউরিটি মঞ্চের নীচে। আমার পরনে ধুতি এবং ওঁরও পরনে ধুতি। আমার বেশবাস দেখে নিলেন। এরপর আমি ডায়েরিটা বাড়িয়ে দিলাম। হাসিমুখে অটোগ্রাফ দিলেন। বললাম— আমি আপনার ভক্ত। 'O.K.' বলে তিনি মধুর হাসি উপহার দিলেন।

খাদ্যরসিক হিসেবে তাঁর সুনাম। কিন্তু সেদিন তিনি খেলেন পরোটা, সবজি আর লাড্ডু। খেতে খেতে 'মিট দ্য প্রেস'।

২০০০ সালের নভেম্বর মাস। হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে 'এন ইউ জে'-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। অতিথিদের মধ্যে আছেন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত, অমর সিংহ প্রমুখ। প্রয়াত অরুণ বাগচীর নামেই মঞ্চ। হায়! তিনি বাজপেয়ীজীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখে যেতে পারেননি। প্রয়াত হয়েছেন আগেই।

ভারতরত্ন (২০১৫) হিসেবে তিনি ভূষিত। এই উপলক্ষ্যে 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় বাজপেয়ীজীকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছে। (১৯ জানুয়ারি, ২০১৫)। আমার সৌভাগ্য, এই বিশেষ সংখ্যায় 'ভগবতী সর্বশুক্লা সরস্বতী' নামে আমার একটি নিবন্ধও প্রকাশিত। কবি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজীর এই বিশেষ সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য 'সম্পাদক'কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯ আগস্ট ২০১৮ রবিবার হলদিয়ার দুর্গাচকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হলদিয়া শাখা আয়োজিত সাহিত্যসভায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কবি অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রতি সম্মান জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বাজপেয়ীজীর প্রতি স্মৃতিচারণা ও তাঁর রচিত কবিতা 'সবুজ সবুজ ঘাসে' পাঠ করে শোনান এই নিবন্ধকার। কবিতাটি ১৪২১ বঙ্গাব্দে দুর্গাপুর বেনাচিতির শারদীয়া ইস্পাতবলয় পত্রিকায় প্রকাশিত। সেই মহাপ্রাণকে প্রণাম। ■

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩


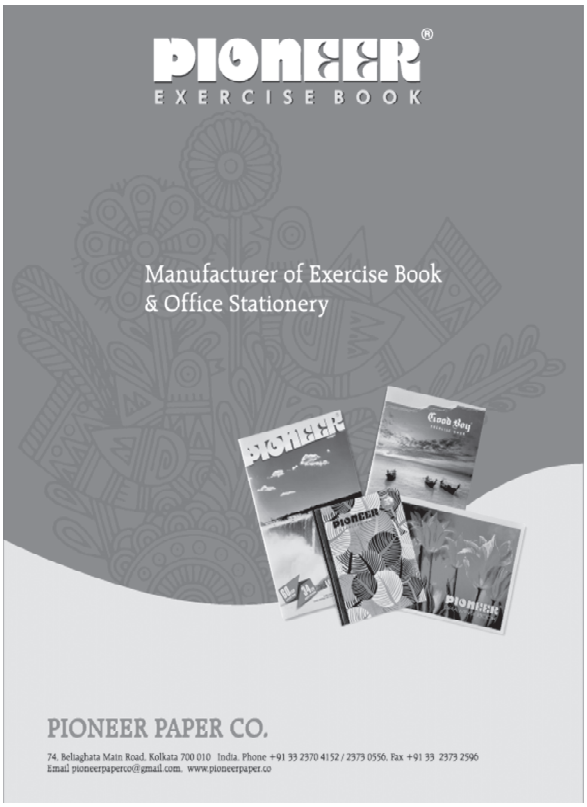



# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**


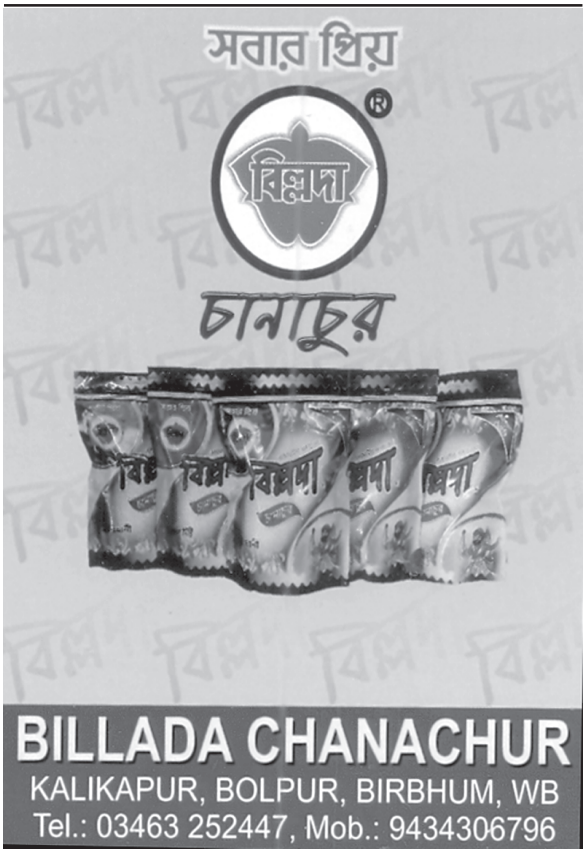

# ভারতীয় গণতন্ত্রের ভূত ও ভবিষ্যৎ অটলবিহারী

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর লেখা 'Republic' থেকে কবিদের নির্বাসন দিয়েছিলেন। নিজে দার্শনিক হয়েও প্লেটো রাষ্ট্রব্যবস্থায় কবিদের ভূমিকা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। ভারতীয় চিন্তায় কিন্তু কবিদের বলা হয়েছে দ্রষ্টা। অনুভবী কবিহৃদয়ের দূরাবগাহী চিন্তার সঙ্গে জনকল্যাণী কর্মের প্রত্যয়ী সমন্বয় যাঁর মধ্যে সুপ্রত্যক্ষ, তিনিই হয়ে ওঠেন জনগণবন্দিত দেশনেতা বা স্টেটসম্যান। সদ্য-প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী নিজগুণে এমনই এক সংবেদী স্টেটসম্যানরূপে অভিনন্দিত হয়েছেন। দীর্ঘ বারো বছর আগে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণে, প্রচারের আলোকবৃত্তের আড়ালে চলে গেলেও, তাঁর নেতৃত্বের মহিমা কিংবা ব্যক্তিত্বের ক্যারিশমা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। সেইজন্যেই বোধহয়, পূর্ণ পরিণত বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটলেও তাঁর গুণকীর্তনে দেশজুড়ে এত মুখরতা।

বিয়াল্লিশের সেই তুমুল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণের মধ্যে দিয়েই নিতান্ত কিশোর বয়সে অগ্নিআঁখরে তাঁর দীক্ষা স্বয়ংসেবকরূপে। স্বাধীনতা লাভের পরে তাঁর দলীয় রাজনীতিতে যোগদান, গুরু জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা- সভাপতি শ্যামাপ্রসাদের একান্ত সহকারীরূপে। তার পরে দীর্ঘ সময় বেয়ে, দায়বদ্ধ গণতান্ত্রিকরূপে তিনি যেমন নিজেকে নির্মাণ করেছেন, তেমনি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কী শাসকদলের প্রধান আর কী বিরোধী দলের নেতারূপে তাঁর সদর্থক ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শস্বরূপ।

অটলবিহারীর বিরল সৌভাগ্য যে, তিনি রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভেই শ্যামাপ্রসাদের মতো এমন বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান, যুগদ্রষ্টা ও যুগস্রষ্টা বাগ্মী গুরু পেয়েছিলেন। শিষ্য অটলবিহারীর চরিত্রে আকর্ষণীয় গুণের বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় তাঁকে শ্যামাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। অটলবিহারীর উদ্দেশ্যের সততা ও বাগ্মিতা নাকি শ্যামাপ্রসাদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অটলবিহারীর প্রতি শ্যামাপ্রসাদের নির্ভরতা এমন ছিল, কাশ্মীরে তাঁর প্রতিবাদী অভিযানের সময় অটলবিহারীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন; কিন্তু বর্ডার পার হওয়ার আগে তাঁকে সঙ্গী হতে বিরত করেছিলেন। বোধ হয় দূরদৃষ্টিপ্রভাবে নিজের যোগ্য উত্তরসাধককে রেখে যেতে এবং আরব্ধ কাজ সমাপন করতে। জীবনের প্রারম্ভে যে একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য আত্মবিকাশের পথে প্রেরণা জোগায়, তা সর্বজনবিদিত। একদিকে রাজনৈতিক জীবনে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদের অধীনে কাজ করার সুযোগ যেমন অটলবিহারীর জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল; তেমনি সংসদীয় রাজনীতিতেও আর এক মহীরুহ ব্যক্তিত্ব, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পরিশীলিত মননশীলতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা, মুগ্ধ অটলবিহারীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিরোধী নেতারূপে শ্যামাপ্রসাদ এবং শাসকদলের নেতারূপে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতো দুই বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান নেতার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যের ফল অটলবিহারীর জীবনে হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে, অটলবিহারীর এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছিল যে, গণতান্ত্রিক ধারার মূলকথা, পরমত সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা এবং সংসদীয় রাজনীতির মূল কথা, অপরের বক্তব্যকে ধৈর্য ধরে শোনা ও তার যুক্তির সারবত্তা অনুধাবনের চেষ্টা করা ও সেইসঙ্গে যুক্তির সাহায্যে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিপক্ষের যুক্তিজালকে ছিন্ন করা।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে জনসঙ্ঘের হাল ধরে ১৯৫৭ সালে অটলবিহারী যখন নির্বাচনে জিতে প্রথম লোকসভায় আসন গ্রহণ করেন, তখন সেটি ছিল বিদ্বান, বুদ্ধিমান, চরিত্রবানদের দেশ নির্মাণে দূরকল্প এক বিদ্বজ্জনসভা। আসরের মধ্যমণি প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বভাবে যতই আত্মতন্ত্রী হোন না কেন, শিক্ষায় ব্রিটিশ লিবারাল হিসেবে ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। সেই জন্যেই সেই সময়ে বিরোধীদের সংখ্যা খুব নগণ্য হলেও তিনি বিরোধী বক্তব্যকে মর্যাদা দিয়ে শুনতেন এবং তার জবাব দিতেন। বাগ্মী শ্যামাপ্রসাদহীন লোকসভায় তরুণ অটলবিহারীর বাগ্মিতা নেহরুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং এক আলাপচারিতায় তিনি অটলবিহারীকে আলাপ করিয়ে দেন, ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রীরূপে।

নেহরুর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অবশ্যই অটলবিহারী সত্য করেছিলেন। কিন্তু সে অনেক পথ পরিক্রমার পর, বিশেষ করে দেশে সফল বিরোধী নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। ফরাসি বিপ্লবের পর নেপোলিয়ন সম্রাট হয়ে বলেছিলেন, I am the revolution. তেমনি অটলবিহারীও বলতে পারেন, আমিই ভারতের গণতন্ত্রের ফসল এবং আমার জীবনই ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারাবিবরণী। নামহীন, খ্যাতিহীন, কিন্তু বিদ্যাবান সৎ সাধারণ ঘরের সন্তান অটলবিহারী, নিজেকে নির্মাণ করে গণতন্ত্রের ধারা বেয়ে দেশের শীর্ষপদে আরোহণ করেছেন, সগৌরবে ও স্বমহিমায়। রাজনৈতিক রাজপরিবার বা রাজনৈতিক সামন্ততন্ত্রের কংগ্রেস, যারা পঞ্চাশ বছরের অধিককাল স্বাধীন ভারতে রাজত্ব করেছে, তার ছত্রছায়ায় অটলবিহারীর

ফঃ ৬

রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়নি। সূচনা থেকেই তিনি এমন একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সেই সময় মনে হতো সুদূরপরাহত।

অটলবিহারী স্বীয় রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের গুণে, শুধু তাকে শাসক দলরূপে সর্বজনগ্রাহ্য করেছিলেন তাই নয়, তাকে রাজনীতির মূল ধারায় একটি অপ্রতিরোধ্য স্রোতোপথের খাতে প্রবাহিত করেছেন। অটলবিহারীর অবদান সে ক্ষেত্রে অপরিসীম।

অতঃপর জরুরি অবস্থায় কারাবরণের পর, ইন্দিরা বিরোধী তরঙ্গে জনতা পার্টির শাসনক্ষমতা লাভে,মোরারজী মন্ত্রীসভায় বিদেশমন্ত্রীরূপে তিনি স্বকীয়তার ছাপ রাখেন, বিশেষ করে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের পুনর্নির্মাণে।

বাস্তবতা বর্জিত প্রাচীন ধ্যানধারণার কট্টরপন্থী মোরারজীর বিচক্ষণতার অভাব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে অদক্ষ চরণ সিংহের একের পর এক ব্যর্থতা ও উচ্চভিলাষী জগজীবন রামের ব্যর্থ প্রয়াসের টানাপোড়েনে অচিরেই জয়প্রকাশের গড়া জনতা পার্টির ভরাডুবি হলো। তখন সেই জনতা পার্টির ভস্মসার থেকে ফিনিক্সের মতো জন্ম নিল সংগ্রামী সাথী লালকৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অটলবিহারীর সভাপতিত্বে নবঅবতারে ভারতীয় জনতা পার্টি, যা বর্তমানে সারা দেশে রাজনীতির মূল ধারায় পরিণত।

কিন্তু যাত্রাপথের প্রারম্ভেই সম্মুখীন হতে হলো এক বিরাট বিপর্যয়ের। ইন্দিরা-হত্যার ফলে, ১৯৮৪ সালে রাজীব সমর্থনের তরঙ্গে, লোকসভায় বিজেপির মিলল মাত্র দুটি আসন। কিন্তু কিছুমাত্র হতোদ্যম না হয়ে পার্টির হাল ধরে থাকার ফলে, শুরু হয় নবজীবনের পালা। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও, বোফর্সের আবর্তে পড়ে রাজীব রাজত্ব হারান। পরবর্তী রাজনৈতিক ডামাডোলে বিজেপি ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিতে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে বাজপেয়ীর বিচক্ষণতা ও লালকৃষ্ণ আদবানীর নেতৃত্বে অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলন তুমুল হয়ে দেখা দেয়। আদবানীর রামরথ যাত্রা যদিও বিহারে এসে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু রামমন্দির বিতর্ক বিজেপিকে তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। আন্দোলনের সেই তুমুল ঝড়ের অবস্থা সম্বন্ধে অটলবিহারীকে মন্তব্য করতে বলায়, তিনি তির্যকভাবে বলেন, ঝড় খুব ভালো কিন্তু ঝড়ের প্রকোপে উড়ে গেলেই মুশকিল।

অবশেষে রাজীব হত্যার পর, নরসিমা রাওয়ের রাজত্বে, রামমন্দির আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় বাবরি কাঠামো ধ্বংস হওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার বিজেপি নেতৃত্বের পুরোভাগে চলে আসেন।

রাজীব গান্ধীর নগ্ন মোল্লাতোষণে, সাহবানো মামলায় অযথা সংবিধান সংশোধন, জনমতকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাছাড়া ভূপাল বিস্ফোরণের নায়ককে দেশ ছাড়ার ব্যবস্থা করা, বোফর্স মামলায় সত্য উদ্ঘাটিত হওয়া ও ইতালিয়ান কুত্রোচ্চির প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান প্রভৃতিতে জনতা ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। তারপর রাজীব হত্যার সহানুভূতি প্রবাহে, নরসিমা রাওয়ের সরকার গঠনের পর, কংগ্রেসে সীতারাম কেশরী ও পরে সোনিয়া গান্ধীর ব্যর্থ নেতৃত্বের অবকাশে, অটলবিহারীর নেতৃত্বে বিজেপি রাজনীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করে।

একথা অনস্বীকার্য যে সহনশীল, উদারপন্থী হওয়ার ফলেই অটলবিহারীর পক্ষে সম্ভব হয় পর পর তিনবার নির্বাচনে গরিষ্ঠতা অর্জন করে সফল কোয়ালিশন সংগঠনে পাঁচ বছরের স্থায়ী সরকার গঠন করে ইতিহাস সৃষ্টি করা। ফলে একদিকে যেমন তিনি প্রমাণ করেন, অকংগ্রেসি সফল কোয়ালিশন সরকার গঠন করে দেশোন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা যায়, ও বিদেশে ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিজেপির নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হলে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বা দাঙ্গার বন্যা বয়ে যায় না; কংগ্রেসের পরিবর্তে একটি সফল রাজনৈতিক ভারতীয় দল দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাছাড়া অটলবিহারী নিজ নেতৃত্বের গুণে প্রমাণ করেছেন, তিনি বিভ্রান্ত চিন্তায় বিজেপির 'মুখোটি' নন, উজ্জ্বল মুখের স্টেটসম্যানশিপের আধার।

প্রধানমন্ত্রীরূপে অটলবিহারীর কৃতিত্বের স্বাক্ষর কম গৌরবের নয়। প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যের প্রয়াস; পোখরানে আণবিক সক্ষমতার সফল পরীক্ষা; চতুর্ভুজ রাজপথে ভারতকে যুক্ত করা; কারগিল যুদ্ধে জয়; টেলিকম বিপ্লবে সাফল্য এবং পরিশেষে বেসরকারিকরণের সাফল্যে অর্থনীতির উন্নয়ন এমনই পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিজেপি ইন্ডিয়া সাইনিং স্লোগান তোলে।

তবে এহ বাহ্য; সর্বোপরি অটলবিহারীর বিশেষ অবদান ভারতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রের ডাইন্যাসটিক ডেমোক্র্যাসির অপরিহার্যতাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে, তিনি সগৌরবে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপভাবে আর একজন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-ও পরিবারতন্ত্রের মূলে আঘাত করে বিরল যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দেশের বদ্ধ অর্থনীতিতে মুক্তির হাওয়া সঞ্চার করেছেন। সেই অর্থনীতিক মুক্তির সফল রূপকার মনমোহন সিংহ অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার হয়ে সুপার প্রধানমন্ত্রী সোনিয়া গান্ধীর আজ্ঞাবহ দাস না হলে সেই অর্থনীতির মুক্তির ধারাকে নতুন দিশা দেখাতে পারতেন। অশিক্ষিত ডাইন্যাসটিক ডেমোক্র্যাসির রাজনীতি যে দেশের কী সর্বনাশ করতে পারে তা সজ্জন বিদ্বান ও কর্মকুশল মনমোহন সিংহের করুণ পরিণতি দেখে বোঝা যায়।

ঠিক এইখানেই অটলবিহারীর একমাত্র 'Disservice to the nation' সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। তিনি যদি জর্জ ফার্নান্ডেজের বোফর্স প্রসঙ্গে Don't touch it বলে অব্যাহতি না দিতেন, তাহলে কংগ্রেসের দলীয় ক্ষমতার শক্তিতে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সুপার প্রধানমন্ত্রীত্বের নগ্নতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রিকে এমন ঠুঁটো জগন্নাথে পর্যবসিত করে দুর্নীতির চিচিং ফাঁক গড়ে তোলা সম্ভব হতো না।

এখানেও অবশ্য অটলবিহারীর চরিত্রের একটি মহানুভবতার প্রমাণ দেয়। যে রাজীব গান্ধী একদিন বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কে অটলবিহারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তিনি রাজীবের গায়ে কালিমার স্পর্শ ঘটতে দেননি। এখানেও মানুষ অটলবিহারী মানবিকতাকে জয়যুক্ত করেছেন, সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ■

# ভাদ্রমাসের কৃষিকাজ

**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী**

**সবজি :** শীতকালীন নানান সবজি চাষের জন্য বীজতলা তৈরি করুন ভাদ্রমাসে। এক মিটার চওড়া, ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু এবং উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের বীজতলা বানিয়ে নিন। বীজ শোধন করে সেখানে বুনুন। উপযুক্ত, পুষ্ট ও নীরোগ চারা মূল জমিতে রোপণ করুন।

ভাদ্রমাসে পেঁয়াজ, মাঝ-মরশুমি ফুলকপি, জলদি সাধারণ বাঁধাকপি, জলদি মটরশুঁটি, ফরা-বিন এবং গাজর বোনার বা লাগানোর সঠিক সময়।

চারা বা বীজ বসাতে হবে বড়কন্দের পেঁয়াজ ১৫ × ১০ সেমি, ছাঁচি পেঁয়াজ ৩০ × ১৫ সেমি. জলদি ও মাঝারি ফুলকপি ৬০ × ৪৫ সেমি, জলদি ও মাঝারি ফুলকপি ৬০ × ৪৫ সেমি; জলদি বাঁধাকপি ৬০ × ৪৫ সেমি; জলদি মটরশুঁটি ৩০ × ৫-১০ সেমি; লতানে ফরাস-বিন ৯০ × ১৫-২০ সেমি, বেঁটে ফরাস-বিন ৪৫ × ১৫-২০ সেমি দূরত্বে।

শীতকালীন সবজির জমি তৈরির জন্য উপযুক্ত মাত্রায় কেঁচোসার বা গোবরসার প্রয়োগ করতে হবে। হেক্টর প্রতি জৈবসার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ : পেঁয়াজ ৫-৬ টন কেঁচোসার এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি, ফরাস-বিন ও গাজরে ১৫-২০ টন এবং মটরশুঁটিতে ২০-২৫ টন গোবরসার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি হেক্টর পরিমাণ জমির জন্য পেঁয়াজে ১২০ : ৫০-৬০ : ৬০-১০০; ফুলকপিতে ১২৫-২০০ : ৮০-১০০ : ৬০-১০০; বাঁধাকপিতে ১৫০-২০০ : ৮০-১০০ : ৮০-১০০ মটরশুঁটিতে ২০-২৫ : ৬০-৮০ : ৫০-৬০; ফরাস-বিনে ৬০-৮০ : ৬০-৮০ : ৪০ এবং গাজরে ৫০ : ৪০ : ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। অণুখাদ্যের অভাবজনিত কারণে সুপারিশকৃত অণুখাদ্য প্রয়োগও জরুরি। এক হেক্টর হলো সাড়ে সাত বিঘা পরিমাণ জমি। নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারকে যথাক্রমে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অফ পটাশে হিসেব করতে হলে ২.২, ৬১ এবং ১.৬ দিয়ে গুণ করে নিতে হবে।

জলদি ও মাঝারি জাতের ফুলকপির জন্য বিঘা প্রতি ৬০-৭০ গ্রাম, জলদি বাঁধাকপির জন্য ৮০-৯০ গ্রাম, জলদি মটরশুঁটির জন্য ১০-১২ কেজি, ফরাস বিনের জন্য ১৩-১৪ কেজি এবং গাজরের জন্য ১.৬-২ কেজি বীজ দরকার। মাঝারি ফুলকপির জাতগুলি হচ্ছে পন্থ শুভ্র, হিসার-১, ইম্প্রুভ জাপানিজ, পুসা শরদ, পন্থ গোবি-৪, পঞ্জাব জায়েন্ট-৩৫ অথবা ডি-৯৬, পুসা আর্লি সিন্থেটিক, পুসা হিমজ্যোতি, পুসা শুভ্র। বাঁধাকপির জাতের মধ্যে গ্রীণ এক্সপ্রেস, রেয়ার বল, মাস্টার এক্সপ্রেস, কৃষ্ণা, হরিরানি, ট্রপিকাল ইত্যাদি উন্নত জাত। মটরশুঁটি জলদি জাতের মধ্যে আর্কেল, হিসার হরিত, জওহর মটর-৪, হরভজন, আলাঙ্কা, আর্লি বাজার, মেটিওর, আসওজি, অলডারম্যান, আজাদ পি-১ ইত্যাদি উন্নত জাত। গাজরের উন্নত জাতগুলি হলো ন্যানটিস, পুসা কেশর, পুসা মেঘালি ইত্যাদি।

**আমন ধান :** শ্রাবণমাসে ধান রোয়ার কাজ শেষ না হয়ে থাকলে ভাদ্রমাসের মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করুন। যারা শ্রাবণ কিংবা আষাঢ় মাসের শেষে ধান রোয়া করে ফেলেছেন তারা সময় বুঝে প্রথম (রোয়ার ৩ সপ্তাহ পর) বা দ্বিতীয় (রোয়ার ৬ সপ্তাহ পর) ঘাস আগাছা তুলে ফেলে চাপান সার দিন। জমি তৈরির পর্বে শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত নাইট্রোজেন সারের এক চতুর্থাংশ, সম্পূর্ণ ফসফেটও অর্ধেক পরিমাণ পটাশ সার দেওয়া হয়। এখন প্রথম চাপান-সার হিসাবে অর্ধেক নাইট্রোজেন ও অর্ধেক পটাশ সার দিতে হবে। দ্বিতীয় চাপানের সময় বাকি এক চতুর্থাংশ নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা দমনের জন্য চারা রোয়ার চার দিনের মাথায় প্রতি বিঘা জমির জন্য ৬০ লিটার জলে ২৫০ মিলি বুটাক্লোর ৫০ ই.সি. গুলিয়ে স্প্রে গুলিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। তা না হলে নিড়ানির সাহায্যে বা হাতে আগাছা তুলে ফেলতে হবে চাপান সার দেবার ঠিক আগে। আমনধানে প্রথম চাপান হিসাবে বিঘা প্রতি ৬ কেজি সাইট্রোজেন এবং ৩ কেজি পটাশ এবং দ্বিতীয় চাপান হিসাবে ৩ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে।

**জলদি আলু :** জলদি আলু আশ্বিনমাস থেকে লাগানো শুরু হলেও ভাদ্রমাস থেকেও লাগানো যায়। কুফরি অশোকা, কুফরি জ্যোতি, কুফরি চন্দ্রমুখী, কুফরি জওহর জাতের আলু বীজ পরিমাণ মতো সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। বিঘা প্রতি আড়াই থেকে তিনি কুইন্টাল বীজ আলুর দরকার হবে। বীজ আলু শোধন করে বসাবেন, ম্যানকোজেবের ০.২৫ শতাংশ দ্রবণে ১০ মিনিট ভিজিয়ে শোধন করা যায়। বিঘা প্রতি মোট ১০ কুইন্টাল জৈবসার এবং যথাক্রমে ৩০, ২০ এবং ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার ব্যবহার করতে হবে। শেষ চাষের সময় জৈবসার ছাড়াও বিঘা প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন এবং পুরোটা ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে বিঘা প্রতি ৩ কেজি হারে জিঙ্ক সালফেট মূল সার হিসাবে জমিতে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আলু বসানোর ২০ ৪০ দিনের মাথায় বাকি নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে। আলু বসানোর সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার।

# মার্কস্‌বাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক

**দেবাশিস লাহা**

**(চতুর্থ পর্ব)**

রাজনীতি তথা কূটনীতির বদান্যতায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে যাবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অস্ত্র দিয়ে আর দিয়ে আর যাই হোক বুর্জোয়া শক্তিকে পরাজিত করা যাবে না। নব নব প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনে শাসক শ্রেণী এখন অমিত শক্তিশালী। তাই কেবল মরতেই হবে। তাই সেনা/পুলিশবিদ্যার হাতে লেনিনবাদী, মাওবাদীর মৃত্যুই এখন অনিবার্য সত্য। একটি প্রবন্ধ থেকে জানতে পারলাম সম্প্রতি কার্ল মার্কসের ছবি লাগিয়ে মাস্টার কার্ড খুব ভালো সাড়া পেয়েছে। ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। তবে ক্রেডিট কার্ডের উপর আত্মপ্রতিকৃতি দেখে এই মহান দার্শনিকটি আদৌ খুশি হতেন কিনা সন্দেহ, বিশেষত যেহেতু বেশিরভাগ বামপন্থা অনুসারী দেশ পরিশেষে ঋণগস্ত, দেওলিয়া হয়ে গেছে, অথবা ধনতন্ত্রকে পুনরায় আলিঙ্গন করেছে। টাটকা উদাহরণ ভেনেজুয়েলা। কিন্তু মার্কসবাদ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্বটি বাদ দিলে যে মতবাদটিই সারবত্তাহীন হয়ে পড়ে— কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো। অতএব পারি না পারি— মুখে তো বলে যেতেই হবে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে তবে কোন ব্যবস্থা বা সিস্টেমটি মানুষের জন্য আদর্শ। উত্তরে বলব কোনো ব্যবস্থাই আদর্শ নয়, যদি মানুষ স্বয়ং নিজেকে মানবতার আদর্শের দিকে পরিচালিত করতে না পারে। পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসিই বলুন, ডেমোক্র্যাটিক সোশালিজমই বলুন আর সমাজতন্ত্রই বলুন, মানসিকতাটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতিপরায়ণ জনতার দেশে কোনো তত্ত্বই সফল হয় না। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থাটি বলবৎ আছে, অর্থাৎ সেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে কাজে লাগিয়েই প্রথম বিশ্বের অনেক দেশ অনেক ভালো আছে। তবে আমরা পারছি না কেন? আপনাকে যদি বর্তমান ভারতবর্ষের

বাস্তব চিত্রটি ভুলে গিয়ে গিয়ে দেশের সংবিধানটিকে পড়তে বলা হয়, হলফ করে বলা যায় মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এত মানবিক, এত যুক্তিযুক্ত কর্মসূচি, দরিদ্রদের জন্য যোজনা, ভরতুকি, আয়কর ব্যবস্থা— দেশের নেতা তথা মানুষ যদি এই সব আইন ঠিকঠাক মেনে চলত, আইন মেনে যাবতীয় কর প্রদান করত, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ অর্থ ঠিকঠাক পৌঁছে যেত, কোনো স্তরেই কোনো দুর্নীতি না থাকত, তবে স্বর্গরাজ্য না হলেও আমরা অনেকটাই ভালো থাকতে পারতাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সেই আত্মানুসন্ধান। সক্রেটিসের প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি মনে পড়ে গেল— Know thyself! নিছক উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার ভিত্তিতে মানুষ নামক প্রাণীটির শ্রেণীবিভাগ করলে সেটি একদেশদর্শী হতে বাধ্য। আর তাই মাও, স্তালিন, পল পটের মতো তথাকথিত কমিউনিস্টদের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। তারা সবাই বুর্জোয়া ছিলেন না। বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থক সন্দেহেও অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে নিছক অনুমান করে নেওয়া হয়েছে মানুষগুলি প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অন্তরকে অবহেলা করে শুধুই বাহিরকে গুরুত্ব দিলে যে গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে না, সেই মননশীল সন্ন্যাসীটি ভালো করেই বুঝেছিলেন— 'মা, আমায় মানুষ কর'! ঠিক যেভাবে জর্জ অরওয়েলের জন্তুগুলো ফিসফিসিয়ে বলেছিল— 'মা, আমাদের জন্তু কর।'

**জর্জ অরওয়েল!**

Animal Farm-এর প্রখ্যাত লেখকটির নাম কেউ কেউ হয়তো শুনেছেন। জানলে অবাক হবেন বিহারের মতিহারি জেলায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা রিচার্ড ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের আফিম দপ্তরে উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন। এক বছর বয়সে অবশ্য তাঁর মা তাঁকে ব্রিটেনে নিয়ে যান। ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজমে বিশ্বাসী অরওয়েল ১৯৪৫ সালে Animal Farm বইটির প্রকাশ করেন। বইটির বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে নিজেই বলেন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার ফলাফল— লেনিন স্তালিনের ভূমিকা— সর্বহারার পরিণতি বইটির বিষয়বস্তু। একে ভিত্তি করেই পশু খামার নামে একটি বাংলা নাটক রচিত হয়। যার প্রদর্শনী এই রাজ্যের বাম আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নাটকটির প্লটটি একটু দেখে নেওয়া যাক।

এক সম্পন্ন কৃষকের একটি খামার বাড়ি ছিল। নাম ম্যানর ফার্ম। সেখানে সমস্ত গৃহপালিত পশু পাখি থাকত। শুয়োর, কুকুর, গোরু, ছাগল ইত্যাদি। একদিন হলো কী ওল্ড মেজর নামে এক গণ্যমান্য শুয়োর জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। বিশাল এক শস্য গোলার মধ্যে এই সমাবেশটি সম্পন্ন হলো। ওল্ড মেজর তাঁর আবেগ মন্দ্রিত কণ্ঠে একটি স্বপ্নের কথা বললেন। স্বপ্নটি তিনি গত রাতেই দেখেছেন। কী স্বপ্ন? সমস্ত জন্তু জানোয়ার এক সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করছে এবং তাদের শাসন/শোষণ করার জন্য কোনো অত্যাচারী মানুষ-মালিক নেই। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন— তোমাদের আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। এই স্বপ্নের রাজত্ব গড়ে তোলার জন্য এক যোগে কাজ করতে হবে, লড়াই করতে হবে, দুনিয়ার জন্তু এক হও। জন্তু জানোয়ারদের একটি গানও শিখিয়ে দিলেন— হে ব্রিটেনের পশু পাখি, নিদ্রা ত্যাগ করো,

অত্যাচারী মানুষ-মালিকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো— কী সুন্দর তার লিরিকস। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই ওল্ড মেজরের মৃত্যু হলো। তাতে কী! স্বপ্নটি তো রয়ে গেল! অতএব Snowball, Napoleon, এবং Squealer নামক তিনটি তরুণ শুয়োর মিলে একটি কর্মসূচি বানিয়ে ফেলল, মহান এক জন্তু দর্শন। নাম দেওয়া হলো Animalism অর্থাৎ জন্তুবাদ! এক গভীর রাতে সমস্ত জন্তু জানোয়ারের সমবেত আক্রমণে ফার্মের মালিক মিস্টার জোন্স পরাজিত হলেন এবং প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। ফার্মটির নাম বদলে হলো অ্যানিম্যাল ফার্ম। তিন জন শুয়োর নেতা ঘোষণা করলেন তাঁরা ওল্ড মেজরের স্বপ্ন সার্থক করতে চান। অতএব সেই স্বপ্ন রাজ্যের জন্য কাজ করতে হবে। বক্সার নামের একটি ঘোড়া সবার আগে এগিয়ে আসে। সে বলে— আমি মন প্রাণ দিয়ে কাজ করব। প্রাণপাত করব। সমস্ত বিশ্বাস আর ত্যাগ দিয়ে এই স্বপ্নরাজ্য নির্মাণে সাহায্য করব।

প্রথমদিকে অ্যানিম্যাল ফার্ম বেশ উন্নতিই করতে লাগল। স্নোবল জন্তু জানোয়ারদের লেখাপড়া শেখাতে শুরু করলেন, নেপোলিয়ন বেশ কিছু কুকুরের বাচ্চাকে অ্যানিম্যালিজমের আদর্শ কী এবং কেন সেই বিষয়ে পারদর্শী করে তুললেন। একদিন মিস্টার জোন্স আবার এলেন তাঁর ফার্ম উদ্ধার করতে। ভয়ানক যুদ্ধ হলো। জন্তু জানোয়ারের গুঁতো আর কামড় খেয়ে আবার পালিয়ে বাঁচলেন। গোয়াল ঘরের মধ্যে এই যুদ্ধটি হয়েছিল বলে নাম দেওয়া হলো— Battle of cowshed! কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন এবং স্নোবল পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন— ফার্মের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে সে নিয়ে তীব্র মতভেদ। তাঁরা ক্ষমতা আর প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার নিয়ে ভয়াবহ খেয়েখেয়ি শুরু করল। (স্তালিন ট্রটস্কির সংঘাত) স্নোবল একটি বিদ্যুৎ চালিত হাওয়াকল নির্মাণ করতে চাইলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন তার তীব্র বিরোধিতা করলেন। একটি জরুরি মিটিং ডাকা হলো— স্নোবল একটি আবেগঘন বক্তৃতায় তাঁর পরিকল্পনার স্বপক্ষে মত জানালে জানালে নেপোলিয়ন বিদ্রূপ করে হেসে উঠলেন। স্নোবলের উপর তিনি তার অনুগত কুকুরগুলি লেলিয়ে দিলেন। এদেরকেই তিনি অ্যানিম্যালিজমের আদর্শ শিখিয়েছিলেন। স্নোবল ফার্ম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। নেপোলিয়ন ফার্মের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের কবজায় নিয়ে ঘোষণা করলেন— আর কোনো মিটিং-এর দরকার নেই। সে যা ভালো বুঝবে তাই হবে। সে আরও জানাল এবার থেকে কেবল শুয়োরের দলই ক্ষমতায় থাকবে। অন্য জন্তু জানোয়ারদের কেবল আদেশ মেনেই চলতে হবে।

স্নোবল পালিয়ে যেতেই নেপোলিয়ন আচমকা মত বদল করলেন। বললেন হাওয়াকল নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। সমস্ত জন্তু জানোয়ার বিশেষ করে বক্সার নামক ঘোড়াটি দিন রাত খেটে হাওয়াকল বানিয়ে ফেলল। কিন্তু ঝড়ের আঘাতে সেটি একদিন ভেঙে পড়ল। আশপাশের দু' একজন মানুষ-কৃষক বলেছিল হাওয়াকলের দেওয়ালগুলি তেমন পুরু হয়নি বলেই ঝড়ে পড়ে গেছে। কিন্তু নেপোলিয়ন তা মানতে নারাজ। সে বলল উঁহু, এ নির্ঘাত স্নোবলের ষড়যন্ত্র। সেই স্যাবোতাজ করেছে। কেবল তাই নয় ফার্মের কোনো কোনো জন্তু স্নোবলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের নামও সে জানে। অতএব তাদের মেরে ফেলা শুরু হলো। কাজে লাগানো হলো হিংস্র কুকুরদের। অনুগত বক্সার ঘোড়াটি নেপোলিয়নের সমস্ত আদেশ শিরোধার্য করল এবং নতুন একটি স্লোগানের জন্ম দিল— Nepoleon is always right. নেপোলিয়ন তার ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করল। নতুন করে ইতিহাস লেখা শুরু হলো। সেখানে বার বার বলা হলো স্নোবল এক ভয়াবহ ভিলেন। আর একটি অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে পড়ল। নেপোলিয়নের আচার আচরণ কেমন মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। যে মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তারা লড়াই করেছিল, শুয়োর হয়েও তাঁর এখন মানুষের মতো আচরণ— বিছানা ছাড়া ঘুমোতে পারে না, হুইস্কি পান করে এবং আশপাশের মানুষ-কৃষকদের সঙ্গে লেনদেন করে। অ্যানিম্যালিজম দর্শনে এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রচার সচিব স্কুইলার জানাল নেপোলিয়ন আমাদের মহান নেতা। ফার্মের ভালোর জন্য উনি দিনরাত্রি এক করে দেন। তাই এসব নিয়ে কোনো সমালোচনা চলবে না, যদিও অন্য জন্তুদের কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে, অনেকে খেতেও পাচ্ছে না।

ফ্রেডরিক নামক এক প্রতিবেশী কৃষক আচমকা একদিন অ্যানিম্যাল ফার্ম আক্রমণ করে বসল। নেপোলিয়নের সঙ্গে কোনো একটি ব্যাপারে চরম মনোমালিন্য। ব্যাপক লড়াই হলো। লড়াইয়ের পুরোভাগ বক্সার। যুদ্ধে আহত হলো সে। ফ্রেডরিক পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আহত বক্সার খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। আগের মতো কাজ করতে পারছিল না। হাওয়াকলে কাজ করতে গিয়ে সে একদিন পড়েও গেল। তারপর সে যে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। স্কুইলার জানায় হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন এই মহান ঘোড়াটির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে বিপ্লবের জয়গান গেয়ে গেছে। পরে অবশ্য জানা যায় হুইস্কি কেনার জন্য টাকার দরকার পড়েছিল— তাই নেপোলিয়ন তার অনুগত সেবকটিকে এক আঠা প্রস্তুতকারকের কাছে বিক্রি করে দেয়।

এর পর শুয়োরেরা আরও বেশি বেশি করে মানুষের মতো হয়ে যেতে লাগল। তারা সোজা হয়ে হাঁটা শুরু করল, হাতে চাবুক, পরনে মানুষের মতো জামাকাপড়। যে সাতটি মহান নীতির উপর ভিত্তি করে অ্যানিম্যালিজমের মহান দর্শন রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে কেবল একটিই দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে রাখা হলো— "all animals are equal, but some animals are more equal than others." সব জন্তুরাই সমান, কিন্তু কিছু জন্তু অন্য জন্তুদের চেয়ে বেশি সমান।

নেপোলিয়ন এক বিশাল পার্টির আয়োজন করল। আমন্ত্রিত হলেন সিস্টার পিলকিংগটন নামে এক মানুষ-চাষি এবং তার পরিবার। নেপোলিয়ন জানাল সে এবার মানুষ-চাষিদের সঙ্গে এক যোগে কাজ করবে এবং মানুষ ও জন্তু উভয়ের মধ্যে যে নিপীড়িত ঘোষিত শ্রমিক শ্রেণী আছে তাদের মুক্তির পথ দেখাবে। সে অ্যানিম্যাল ফার্মের নাম বদলে আবার ম্যানর ফার্ম করে দিলেন। বলল আগের নামটিই ভালো। ফার্ম হাউসের সংকীর্ণ জানালা দিয়ে পরিশ্রান্ত, অর্ধভুক্ত জন্তুরা সেই জাঁকজমক পূর্ণ পার্টির দিকে চেয়ে রইল। কত রকমের সুস্বাদু খাবার দাবার, কত রোশনাই। মহার্ঘ জামাকাপড়। কত সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষ। সময় যত গড়াচ্ছে, উচ্ছ্বাস তত বাড়ছে। উদ্দাম গানের সুরে সবাই কেমন মাতাল হয়ে উঠেছে। অনাহার ক্লিষ্ট জন্তুগুলোর চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে— প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওরা বুঝে উঠতে পারছে না, কে শুয়োর আর কে মানুষ।

*(শেষ)*

# কেরলের পাশে রয়েছে সমগ্র দেশ : প্রধানমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সমগ্র দেশ কেরলের পাশে রয়েছে। যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে কেরল, তার মোকাবিলা করতে ১২৫ কোটি ভারতবাসী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। মন কি বাত অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মৃত্যুর কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। কেরলের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, কোনো ক্ষতিপূরণই সেই শোক ভুলিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ১২৫ কোটি ভারতীয় এই দুর্দিনে কেরলবাসীর পাশে রয়েছেন। যারা আহত হয়েছেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন--- তাঁরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন— আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা করি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কেরলে বন্যা দুর্গত এলাকাগুলিতে ত্রাণ পাঠানো এবং আর্ত মানুষদের উদ্ধারের কাজে কোথাও কোনোরকম গাফিলতি রাখা হচ্ছে না। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যত দ্রুত সম্ভব আর্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। সমস্ত

বিপদকে অগ্রাহ্য করেই আর্ত মানুষকে উদ্ধারের কাজ করছেন তারা। দেশের মানুষ তাদের এই কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।'

কেরলের ওনাম উৎসাবের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওনাম উৎসবে এই প্রার্থনাই করি যে, ঈশ্বর যেন কেরলের মানুষকে শক্তি দেন। কেরল যেন আবার দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে এবং দ্রুত গতিতে যেন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়।'

এদিকে কেরলের বন্যায় সৌদি আরব ৭০০ কোটি টাকা সাহায্য করবে বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক ছড়িয়েছে। কেরলের বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দাবি করেছিলেন, সৌদি আরব কেরলকে ৭০০ কোটি টাকা সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে। পিনারাই বিজয়নের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারেও নেমে পড়েছিল সিপিএম। কিন্তু সৌদি আরবের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে— ৭০০ কোটি টাকা সাহায্য করা হবে এমন কথা তারা কখনই বলেনি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে--- বিজয়ন এইরকম দাবি কেন করলেন?

## রেলমন্ত্রীর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভারতীয় রেলওয়ের সবকটি বিভাগের আঞ্চলিক ম্যানেজারদের স্ব-স্ব অঞ্চলের সংসদ সদস্য এবং বিধায়কদের সঙ্গে অবিলম্বে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সব সাংসদদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তাঁরা যেন আঞ্চলিক ম্যানেজারদের জানান, কোন সময়ে তাঁদের পক্ষে বৈঠক করা সম্ভব। আঞ্চলিক ম্যানেজারদের রেলমন্ত্রী বলেছেন— তাঁরা যেন সংসদ সদস্য এবং বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনে নেন— কোথায় কোথায় রেল সংক্রান্ত কী সমস্যা রয়েছে এবং কোথায় কোথায় নতুন কী পদক্ষেপ করা যায়।

বিধায়ক এবং সাংসদদের সঙ্গে আঞ্চলিক ম্যানেজারদের বৈঠক করার পরিকল্পনার পিছনে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর একটি অন্য ভাবনা রয়েছে। রেলমন্ত্রক সূত্রের খবর, প্রায়ই বিভিন্ন রাজ্যের সাংসদ এবং বিধায়করা রেল সংক্রান্ত নানারকম দাবিদাওয়া নিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে ধরনা দেন। এছাড়াও রেল সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অভিযোগও তাঁরা জানান। রেলমন্ত্রী মনে করেন— সাংসদ এবং বিধায়কদের এই দাবি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাদের মাধ্যমেই এলাকার জনগণের দাবিদাওয়াও জানা যায়। তাছাড়া, কোন অঞ্চলে রেলের কোন কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা উচিত তা সেই এলাকার সাংসদ এবং বিধায়করাই সঠিকভাবে জানাতে পারবেন বলে মনে করেন রেলমন্ত্রী। এই ধরনের বৈঠকের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের ফাঁস থেকে রেলমন্ত্রককে মুক্ত করাও আর একটি উদ্দেশ্য বলে মনে করছে তথ্যভিজ্ঞ মহল।

# স্বস্তিকা

## পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

**মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে**

*পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা*

### দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

### উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

### উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

### গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

### ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

### জীবন-কথা

জহর মুখোপাধ্যায় - মশাল হাতে সিংহ পুরুষ

### প্রবন্ধ

ডা: অমূল্যরতন ঘোষ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জয় সেন, দেবীপ্রসাদ রায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন নিয়োগী, জয়ন্ত কুশারী

**আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা**

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

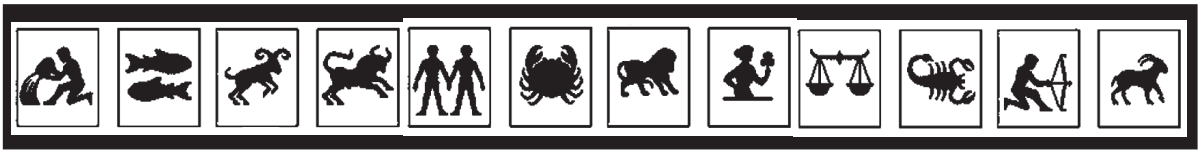

**৩ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ৯ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, সিংহে রবি-বুধ, তুলায় শুক্র-বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, মকরে মঙ্গল-কেতু। রবিবার ভোর ৩-২০ মিনিটে শুক্রের তুলায় প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে রোহিণী থেকে সিংহে মঘা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** ভ্রাতা-ভগ্নীর মেধার বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদদের ভাগ্যোদয় ও বিলাসী জীবন, শিল্পানুরাগীদের প্রেম-প্রীতি ও সৃজনশীলতায় স্বাচ্ছন্দ্য পদচারণা। মিত্র সমাগমে নিকট ভ্রমণ। বিদ্যার্থী ও সন্তানসন্ততির জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি।

**বৃষ :** পিতা-পুত্রের সুকৃতি-সম্ভ্রম। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির যোগ। আর্থিক শুভ বিলাসব্যসনে ব্যয় যোগ। যুবক-যুবতীর অশুভ দৃষ্টি শান্ত ও সংযতভাবে মোকাবিলা করুন। কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। ভালো বন্ধু ভালো কাজের সহায়ক। হঠাৎ দূরদেশে ভ্রমণ।

**মিথুন :** জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উৎকর্ষ, উৎফুল্লতায় ভরা মন। জগতের কর্মযজ্ঞে প্রতিভার পূর্ণ মূল্যায়ন ও মান্যতা, অগ্রজ ও চাকুরেদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। ক্যালকুলেটিভ আইডিয়ায় লিখিত কর্মে প্রসার ও শংসা। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বিরোধিতা ও শরীরের কারণে উদ্বেগ।

**কর্কট :** গৃহের পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য হতাশার কারণ হবে। চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। কর্মপ্রাপ্তি ও পেশাদারদের আধিপত্য বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য, গুরুজনের সান্নিধ্যে সুপরামর্শ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

**সিংহ :** আয়ের একাধিক পথের সন্ধান। জমি-বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের জ্ঞানার্জনে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর যা গর্ব ও আনন্দ দেবে। কোনো বন্ধুর পরামর্শ আর্থিক ক্ষতির কারণ। প্রেম-প্রীতি- ভালবাসা ও স্বজন বাৎসল্যে সম্পৃক্ত মন। কৃষি ও কৃষকের প্রাপ্তি শুভ।

**কন্যা :** প্রীতিকর, মেলবন্ধন, গৃহসুখ, উচ্চশিক্ষা অথবা কর্মসূত্রে স্থানান্তর, শৌখিন ও বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ। সমাজ-প্রগতিমূলক কর্মে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। কর্মের যোগসূত্রে ভালো বন্ধুলাভ। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক।

**তুলা :** পতি-পত্নী উভয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। নিকটজনের মন্দ ব্যবহার মানসিক কষ্টের কারণ। রিপ্রেজেন্টেটিভ ও যানবাহন ব্যবসায় আর্থিক শুভ। নীতিগত বিষয়ে অনেকাংশে সমঝোতা করে চলতে হবে। গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কারে ব্যয়াধিক্য যোগ।

**বৃশ্চিক :** লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, আধিপত্য, মান্যতা ও আর্থিক শুভ। সন্তানের জ্ঞানার্জনে সাফল্য। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ও গুণীজনের সান্নিধ্য। সপ্তাহের প্রান্তভাগে উদার হৃদয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা। রমণীদের প্রতি দুর্বলতা ও মাথায় চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

**ধনু :** পড়াশুনায় চাপের কারণে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি। সততা, সরলতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, উদারতা, দৃঢ়তা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সম্পৃক্ত মন। সাহিত্য পিপাসু ও শিল্প রসিকদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও মান্যতা। খনিজ, যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় প্রাপ্তি শুভ।

**মকর :** ভ্রাতা, ভগ্নী ও প্রতিবেশীর নতুন কোনো খবর যা আনন্দ ও মর্যাদার। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন, মনকষ্ট। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। সন্তানের মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ। প্রেমের লুব্ধ দৃষ্টিতে রাহুর গ্রাস।

**কুম্ভ :** গহনা-গ্রহরত্ন, খনিজ ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তির ঐশ্বর্য শুভ। গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও বিলাসব্যসনে আগ্রহ বৃদ্ধি। বেকারদের কর্মসংস্থানে প্রবাস। হস্তশিল্প, চর্মজাতদ্রব্যে অভিজ্ঞতার বাস্তব মূল্যায়ন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি।

**মীন :** পরিজন সান্নিধ্যে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে যোগদান। আদর্শগত ব্যাপারে সমঝোতা করাই শ্রেয়। গুরুজনের পরামর্শ অর্থাগমের ক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করবে। সপ্তাহের অন্তভাগে বিরোধিতা ও সমালোচনার ঝড় পীড়াদায়ক হবে।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য